অনু বন্দ্যোপাধ্যায়

অনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান কলকাতা মহানগরী। ইংরাজিতে স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভ করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রখ্যাত অধ্যাপকের কন্যা হিসাবে কিশোরকাল থেকেই তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখ জ্ঞানী পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসেন। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও জহরলালের সঙ্গেও একাধিকবার মেলবার, আলাপ করবার সুযোগ তিনি লাভ করেছিলেন। ভারতের প্রথম কস্তুরবা গ্রামসেবিকা শিক্ষণ শিবিরে তিনি যোগ দেন এবং গোড়া-পত্তনকাল থেকে তিন বছর বাংলার পল্লীগ্রামে কস্তুরবা শিবিরে কাজ করেছিলেন। ভারত ভাগের পূর্বে হিন্দু-মুসলীম দাঙ্গার সময় নোয়াখালি যান এবং সেখানে গান্ধীজীর নৈকট্যলাভ করেন। প্রায় দশ বছর গান্ধীজীর বৃহত্তম জীবনী "মহাত্মা"র লেখকের সঙ্গে এ বইয়ের কাজে যুক্ত ছিলেন, ফলে গান্ধীজী সম্বন্ধীয় তথ্য এবং তাঁর লেখা ও মতবাদের সঙ্গে তিনি গভীরভাবে পরিচিত। শ্রীযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায় তীর্থযাত্রী। মহামানবদের বিচিত্র কর্মতীর্থে তিনি হৃদয়ের গভীর জিজ্ঞাসা আর ঔৎসুক্য নিয়ে বার বার যাত্রা করেছেন।

বহুরূপী গান্ধী
অনু বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপা
ছ'টাকা

বহুরূপী গান্ধী

মেথরের কাজ থেকে শুরু করে পুরোহিতের কাজ পর্যন্ত সমাজের সকল শ্রেণীর কাজ গান্ধীজী হাসিমুখে করে যেতেন। ক্ষুদ্র বলে কোন কিছুকে ঘৃণা করতেন না, সাধারণ বলে কাউকে দূরে সরিয়ে রাখতেন না। ছোটকে বড় করে দেখবার একটি আশ্চর্য অণুবীক্ষণ ছিল তাঁর হাতে। তাই অগণিত সাধারণ মানুষের কাছে তিনি একান্ত প্রিয় হতে পেরেছিলেন।

আমরা গান্ধীজীবনের এই গল্পগুলির ভেতর দেখতে পাব সেই মানুষটিকে যিনি তাঁর অতি উচ্চ আসন থেকে নেমে এসেছেন সাধারণ মানুষের ভীড়ে, যারা শ্রমের ভেতর দিয়ে সারাক্ষণ সেবা করে যায় সমস্ত সমাজের। আমরা দেখতে পাব সেই বহুরূপী গান্ধীকে যিনি সমস্ত দেশের শিরোমণি হয়েও সকলের দীনতম সেবক।

প্রথম মুদ্রণ : এক হাজার
কার্তিক, ১৩৭৪ : অক্টোবর, ১৯৬৭

প্রকাশক :
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২
৯৪ সাউথ মাল্লাকা, এলাহাবাদ-১
১১ ওক্ লেন, ফোর্ট, বোম্বাই-১

মুদ্রক :
জয়ন্ত বাক্‌চি
পি. এম. বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোম্পানী (প্রাঃ) লিঃ
১৯ গুলু ওস্তাগর লেন
কলকাতা-৬

রেখাচিত্র :
খালেদ চৌধুরী
প্রচ্ছদশিল্পী :
গণেশ বসু

দাম :
ছ'টাকা

প্রস্তাবনা

এটা ছোটদের বই হলেও, বড়রাও এটা পড়ে খুশী হবেন, লাভবান হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

ইতিমধ্যেই গান্ধীজী রূপকথার মানুষ হয়ে পড়েছেন। যারা তাঁকে দেখেনি তারা, বিশেষত এ যুগের শিশুরা ভাবে, তিনি ছিলেন এক অস্বাভাবিক পুরুষ, এমন এক অতিমানব যিনি খুব বড় বড় কাজ করতেন। তাঁর জীবনের সহজ সাধারণ দিকটা তাদের সামনে তুলে ধরা দরকার, এ বইটি সে কাজ করেছে।

নানা বিষয়ে রস নেবার অনন্যসাধারণ অভ্যাস গান্ধীজীর ছিল। তিনি যখন যে কাজে মন দিতেন তা বেশ ভালোভাবেই করতেন। কোনও কিছু ভাসাভাসা-ভাবে করা তাঁর ধাতে ছিল না। জীবনের তথাকথিত ক্ষুদ্র-তুচ্ছ কাজগুলিও নিপুনভাবে করায় তাঁর মানবিকতা প্রকাশ পেত, তাঁর চরিত্রের ভিত এতে গড়ে উঠেছিল।

তাঁর দেশের কাজ করার ও রাজনীতি করার কথা বাদ দিয়ে তিনি কেমনভাবে এমন নানা কাজ করতেন তার বর্ণনা এ বইয়ে পেয়ে আমি খুশী হয়েছি। হয়ত এ বিবৃতিতে তাঁর আসল রূপ স্পষ্টতরভাবে ফুটে উঠবে।

—জহরলাল নেহরু

নয়া দিল্লী
১০ই মার্চ, ১৯৬৪

দু'এক কথা

এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি আমার কাছে ১৯৪৯ সাল থেকে পড়ে আছে। সঙ্কোচবশত আমি এতদিন এটা ছাপাইনি। ১৯৪৮ সালে বাঙলার কস্তুরবা শিক্ষাশিবিরের কাজ ছাড়ার পর আমি ডি. জি. তেণ্ডুলকরের "মহাত্মা" বইয়ের পাণ্ডুলিপি পড়ি। বছর তিনেক গ্রামে কাজ করার সময় আমি লক্ষ্য করেছিলুম যে, আমার সঙ্গিনী শিক্ষার্থিনীরা ও গ্রামবাসীরা গান্ধীজীর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানে না। অথচ তারা গান্ধী-জয়ন্তী পালন করত, প্রতিদিন চরকা কাটত, প্রার্থনা করত। তাদের মধ্যে কেউ বা স্বাধীনতা আন্দোলনে ভাগ নিয়ে কয়েদভোগ করে এসেছিল। তবু জাতীয় জীবনে গান্ধীজীর প্রকৃত দান কি, তা তারা জানত না। হয়তো আমি ভুল বিচার করেছি, কিন্তু তখন আমার তাই মনে হয়েছিল।

এখনও প্রতিদিন নানা ধরনের মানুষের সংস্পর্শে এসে আমার সেই মনোভাবই জাগে। তাদের মধ্যে অনেকে শিক্ষিত, অনেকে গান্ধীজীর বিরূপ টীকা করে, আর সকলেই কায়িক শ্রম এড়াতে উৎসুক।

জীবিকা অর্জনের জন্য বাধ্য হয়ে সাধারণত লোক যে সব কাজ করে গান্ধীজী সেগুলি স্বেচ্ছায় কত খুশীমনে করতেন তা দেখাবার চেষ্টা আমি করেছি। ইচ্ছা করে কতকগুলি বিষয়ের পুনরুল্লেখ করেছি।

গান্ধীভক্তের দল বাড়াবার প্রবৃত্তি আমার নেই। গান্ধীজী যে কেবল জাতির জনক আর স্বাধীনতার হোতা ছিলেন না, এটা ছোটরা জানুক, এবং তা জানার পর তারা তাঁর সমালোচনা করুক এই আমার কাম্য।

মূলত কিশোরদের জন্য লেখা এ বইয়ের পরিকল্পনা আমার। প্রায় সব তথ্যাদি তেণ্ডুলকরের "মহাত্মা" থেকে সংগৃহীত। এই ছোট বইটি লেখার জন্য তাঁর কাছে আমি কত ঋণী তা বলে বোঝাতে পারব না। এ বইয়ের বহু বিষয়বস্তু আনন্দবাজার ও যুগান্তর ছেপেছেন।

যদি হাজারকরা একটি নবীন পাঠকও গান্ধীজীর নানা মহৎকাজের একটিরও ভাগীদার হয় তো আমি খুশী হব।

শত কাজে ব্যস্ত জহরলালজী অসুস্থ দেহে এর প্রস্তাবনা লিখে দেওয়ায় আমি বিশেষভাবে উপকৃত ও ঋণী হয়েছি।

অনু বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচী

কাজের মানুষ

দক্ষিণ আফ্রিকায় এক নামী ভারতীয় ব্যারিস্টার নিজের আইনী মামলা মকদ্দমা চালাতেন, বাদী-বিবাদীদলকে আপসে ঝগড়া মিটিয়ে নিতে বলতেন আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে সময় করে হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান প্রভৃতি ভিন্নধর্মের বই পড়তেন, পণ্ডিতদের লেখা অন্য বইও পড়তেন। এসব বই পড়ে, জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করে তাঁর মনে ধারণা জন্মাল যে প্রত্যেক মানুষের রোজ কিছু শ্রম করা দরকার। শুধু বুদ্ধি খাটিয়ে যে কাজ করা হয় তাকে মর্যাদা দিলে হবে না, শরীর চালনা করে যে কাজ করতে হয় তাকেও মান দিতে হবে। কারিগর ও চাষীর জীবনই তাঁর চোখে আদর্শ জীবন মনে হতে থাকল।

তিনি বুঝলেন যে সমাজের সকল মানুষের ভালমন্দের সঙ্গে একজন বড় মানুষের ভালমন্দও জড়িয়ে থাকে। যদি অনেক লোক দুঃখে কষ্টে দিন কাটায় আর কয়েকজন নামজাদা ধনী ডাক্তার-মোক্তার-পণ্ডিত মহা আরামে বাস করে তো তাকে ভাল সমাজ-ব্যবস্থা বলা চলে না। সকলের খাটুনির দাম আছে, কোনও কাজই হীন নয়। পণ্ডিত ও মূর্খ, শিক্ষক ও মেথর সকলেই সমান বেতনের অধিকারী। একজন জ্ঞানী আমাদের মনের ময়লা ঘোচাতে, আমাদের অজ্ঞান নাশ করতে সাহায্য করে, তেমনই একজন মেথর আমাদের শরীরের মলময়লা সাফ করে, জঞ্জাল দূর করে। এদের কোনও একজনকে বাদ দিলেই আমাদের অসুবিধা ঘটে। পণ্ডিত একদিন না পড়ালে যদি বা চলে, মেথর একদিন না এলে পথচলা বা ঘরে বাস করা দুঃসাধ্য হয়।

তিনি ক্রমশ নিজের জীবনের চালচলন বদলে ফেললেন এবং নানা-রকম কাজের ভাগীদার হতে লাগলেন। তাঁর বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তিনি আশ্রম বেঁধে থাকবেন ঠিক করলেন। জনকয়েক সাহেব বন্ধুও এ দলে দলী হয়ে ঐভাবে থাকতে রাজী হলেন। এই আশ্রমে মাইনে-করা চাকরদাসী থাকবে না স্থির হল। একদল লোক কেবল মল-জঞ্জাল সাফ করবে আর তাদের "মেথর" নাম দিয়ে অন্যরা ঘেন্নায় ছোঁবে না, তাদের সঙ্গে মিশবে না, খাবে না, এ ব্যবস্থা বাতিল করলেন। সেখানে হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, গরীব শ্রমিক, ধনী ব্যারিস্টার, ধলা সাহেব, কালা ভারতবাসী বন্ধুর মতো গলাগলি হয়ে বাস করত, সবজি ফলের চাষ করত। এক রান্নাঘরে সকলের নিরামিষ রান্না হত। মোটা খেয়ে, মোটা পরে, স্বাবলম্বী হয়ে সবাই থাকত। প্রত্যেকের মাথাপিছু মাত্র ৪০৲ টাকা খরচ মিলত। ব্যারিস্টার সাহেব তখন মাসে চার হাজার টাকা উপায় করতেন, তাঁর ভাগেও ঐ হাতখরচ বরাদ্দ ছিল।

কাজের জগতে তিনি জাতবিচার করতেন না, যখন যে কাজে ডাক পড়ত তাই ভালভাবে করার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। এই পাতলা গড়নের মাঝবয়সী মানুষটির দেহমনে অফুরন্ত শক্তি ছিল। কখনও কখনও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র পাঁচ ছ' ঘণ্টা ঘুমিয়ে বিশ্রাম নিয়ে, বাকী সময়ে তিনি ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়ম বেঁধে একটার পর একটা কাজ করে যেতেন। আশ্রমে নতুন ঘর বাঁধার সময় তিনি সকলের আগে টিনের চালের মটকায় উঠে যেতেন। তখন তাঁর পরনে থাকত মোটা নীলরঙের প্যান্ট; সে প্যান্টে ছোটবড় বহু পকেট থাকত। ভিন্ন ভিন্ন পকেট থেকে ছোটবড় স্ক্রু, পেরেক, হাতুড়ি, বাটালি, উঁকি মারত। কোমরবন্ধে ছোট করাতবন্ধ ঝুলত। খটখট ঠকাঠক শব্দে তিনি কড়া রোদ মাথায় নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করে যেতেন। তাঁর সকল কাজে অদ্ভুত চেষ্টা আর নিষ্ঠা ছিল। এক দুপুরে খেয়ে উঠে তিনি যন্ত্রপাতি নিয়ে ছুতোরের কাজে লেগে গেলেন। অবিরাম সাত ঘণ্টা

খেটে-ছাদ সমান এক বিরাট মাপের বইরাখা শেলপো বানিয়ে তবে উঠলেন।

একবার আশ্রমের কাঁচা রাস্তা পাকা করার দরকার হয়। ইঞ্জিনীয়ার যে লম্বা খরচের ফর্দ দিয়েছিল তা মেটাবার পয়সা আশ্রমের তহবিলে ছিল না। তিনি প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা বেড়িয়ে ফেরবার সময় মাঠ থেকে নুড়ি কুড়িয়ে এনে উঠানে জড় করতে লাগলেন। তাঁর দেখাদেখি সঙ্গীসাথীরাও পাথর জমা করতে থাকল। ধীরে ধীরে রাস্তায় খোয়া ফেলার উপযোগী ছোটখাট পাথরের পাহাড় তৈরী হয়ে গেল। এভাবে তিনি মিত্র-বান্ধবী ছেলেপুলে সকলকে নানা কাজে লাগিয়ে দিতেন। আশ্রমে কারিগরি বিভাগ খুলেছিলেন। শিক্ষার্থীদের ছুতোর, তাঁতী, মালী, মেথরের কাজ শেখান হত। পাকা দর্জি ও চামার এসে বিনাবেতনে শিক্ষানবীসদের তালিম দিত।

ব্যারিস্টার সাহেব রোজ সকালে যাঁতায় খানিক গম পেষাই করে, পোশাক পরে পাঁচ মাইল পথ হেঁটে নিজের দপ্তরে যেতেন। কোনদিন বা চুল ছাঁটতেন, কাপড় কাচতেন। সারারাত জেগে প্লেগরোগী মজুরদের সেবা করায় তাঁর আলস্য ছিল না, কুষ্ঠরোগীর ঘা ধোয়াতে ভয় ছিল না, মলমূত্র পাইখানা নর্দমা সাফ করাতে ঘেন্নালজ্জা ছিল না।

তিনি নিজের সাপ্তাহিক পত্রের জন্য নিয়মিতভাবে ভাল ভাল প্রবন্ধ লিখতেন, সে লেখা টাইপ করতেন, নিজ ছাপাখানায় তা ছাপার হরফে সাজাতেন এবং দরকার হলে হাতচাকী চালিয়ে ছাপার যন্ত্র চালু রাখতেন। তাঁর যে শিল্পীহাত-চিন্তাশীল রচনা লিখত, চরকায় সুতো কাটত, তাঁত বুনত, ছুঁচের কাজ করত, গাছে ফলফুল ফলাত, সেই পরিশ্রমী হাতই মাটি কোপাত, কুয়ো থেকে জল তুলত, কাঠ কাটত, ঠেলাগাড়ী থেকে ভারী মাল নামাত। আফ্রিকার জেলে তাঁর ভাগে শক্ত পাথুরে জমি কোপাবার ভার পড়েছিল। গাঁইতি চালাতে চালাতে হাতে ফোস্কা পড়ে ঘা হয়ে যেত, যখন বড় কষ্ট হত তখন তিনি ভগবানের কাছে শক্তি ভিক্ষা করতেন। কাজে অপারক এ বদনাম

তাঁর সইত না। অসুবিধে ঘটেছে বলে নির্দিষ্ট কাজ করতে না পারার বায়নাও তাঁর মনঃপূত হত না।

প্রায় আশী বছর বয়সেও কয়েক সপ্তাহ দৈনিক ১৮ ঘণ্টা কাজ করেছিলেন, কখনও বা কাজের সময় বেড়ে ২১ ঘণ্টায় পৌঁছত। তখন দেহের খাটুনির কাজ করতে না পারলেও শীতের ভোরে হিমেল পথে খালি পায়ে তিন চার মাইল হাঁটুনিতে হটতেন না। জোয়ান বয়সে কতবার রাত দুটোয় উঠে জোর কদমে বিশ ক্রোশ পথ হেঁটে আশ্রমের জন্য শহর থেকে সওদা এনেছিলেন। ডুলিতে আহত সৈনিক নিয়ে পনের ক্রোশ পথ হেঁটেছিলেন দিনের পর দিন।

তাঁর অসীম কর্মক্ষমতা আর অনড় কর্মনিষ্ঠা দেখে তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকার বন্ধু ও কর্মীরা তাঁকে কর্মবীর আখ্যা দিয়েছিলেন। কর্মবীর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর পোর বন্দরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

বিবেকী ব্যারিস্টার

গান্ধী ১৮ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তার দশ মাস পরে তিনি আইন পড়তে বিলেতে চলে যান। মোঢ়বানিয়াদের মধ্যে তিনিই প্রথম কালাপানি পার হয়ে দূর প্রবাসে গিছলেন। বিলেতের ইনার টেম্পল্ নামে আইন সংস্থায় ভর্তি হবার পর গান্ধী জানতে পারলেন যে আইন পরীক্ষায় পাস করা অতি সহজ। দু'মাস মাত্র পাঠ্য-পুস্তকের নোট পড়ে অনেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যেত। ও নোট পড়ার রীতি তাঁর মনঃপূত হয়নি। কোনও রকম তঞ্চকতা তাঁর সইত না সেজন্য তিনি সব ক'টি মূল পুস্তক পড়তে মনস্থ করেন, বই কেনার জন্য অনেক টাকা খরচ করেন। ল্যাটিন ভাষা শিখে ল্যাটিনে লেখা রোমান্ আইনের মূল বইগুলি পড়ে ফেলেন।

সে যুগে ব্যারিস্টারদের খানা-খাইয়ে ব্যারিস্টার বলা হত। তাদের তিন বছরে কম পক্ষে বারোটা বৈঠকে যোগ দিয়ে ৭২ বার খানা খেতে হত। গান্ধী ছিলেন গোঁড়া নিরামিষাশী; আমিষ সুরুয়া-কোপ্তা-কাবাব খেতেন না আবার মদ স্পর্শ করতেন না। আপনভাগের বরাদ্দ পানাহারের মাত্রা বেড়ে যাবে বলে আইনবিভাগের বহু পড়ুয়া তাঁকে টেবিলের সাথীহিসেবে পাবার জন্য উৎসুক থাকত।

এসব খানাপিনা আর পঠনপাঠন গান্ধীকে তাঁর মুখচোরাভাব কাটিয়ে ওঠায় একটুও সাহায্য করেনি। শেখা পুঁথিগত বিদ্যা কেমন ভাবে কাজে লাগাবেন তা ভেবে তিনি কূল পেতেন না। এক নামী

ইংরেজ আইনজীবী তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে সৎ আর শ্রমশীল হলে ভাল আইনজীবী হওয়া যায় আর সচ্ছলভাবে চলার যোগ্য যথেষ্ট টাকা রোজগার করা যায়। তিনি গান্ধীকে ইতিহাস এবং সাধারণ-জ্ঞানের কিছু বই পড়তে নির্দেশ দেন। গান্ধী এ পরামর্শ মতো ওসব বিষয়ে কয়েকখানি বই পড়ে নিয়েছিলেন।

বিলেতবাসকালে কিছুদিন গান্ধী চোস্ত সাহেব সাজার চেষ্টা করেন। ইংরেজী শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ শেখায়, বক্তৃতার ঢঙ আয়ত্ত করায়, বেহালা বাজিয়ে তালে তালে নাচতে শেখায় এবং কেতাদুরস্ত পোশাক পরায় পটু হবার জন্য তালিম নিতে থাকেন। বম্বের দর্জির করা পোশাক বাতিল করে বণ্ড্ স্ট্রীটের বিখ্যাত দোকান থেকে দামী পোশাক কিনে, সোনার ডবল ঘড়িচেন ঝুলিয়ে সে পোশাকে ঘুরতে শুরু করেন। চোস্ত চোঙা টুপি, মনোহর টাই, আড়ষ্ট কলার সার্ট ব্যবহার করতে থাকেন। যুবতীদের সঙ্গে মিতালিও করেন। সহসা একদিন তাঁর ভুল ভাঙল, টনক নড়ল, বুঝলেন কি মোহিনী মায়ায় তিনি বাঁধা পড়ছেন। এসব বাবুগিরি অভ্যাসের দাস হয়ে তিনি বড় দাদাকে টাকার তাগিদ দিয়ে কত বিপর্যস্ত করছেন। কেতাকায়দা রপ্ত করে নকল সাহেব সাজার জন্য তো তিনি বিলেতে আসেননি, তিনি এসেছেন পড়তে। চটপট তিনি তাঁর চালচলন বদলে ফেললেন। একটা সস্তা ঘর ভাড়া করে, স্টোভ এনে তিনি নিজেই প্রাতরাশ আর নৈশভোজ বানাতে লেগে গেলেন। মধ্যাহ্ন ভোজন সারতেন নিরামিষ ভোজনালয়ে কমদামী খাবার খেয়ে। গাড়ীভাড়ার খরচা বন্ধ করে, পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতে থাকলেন ফলে থাকাখাওয়ার ও রাহা খরচ কমে গেল। দৈনিক দু' তিন ক্রোশ হাঁটার সু-অভ্যাস রপ্ত করে ফেললেন।

ইংলণ্ডে আড়াই বছর থাকার পর যথাকালে গান্ধী আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, ব্যারিস্টারী খাতায় তাঁর নাম ওঠে। অন্য দেশ বিদেশ না ঘুরে তিনি দু'দিন পরেই জাহাজে ভারতের পথে যাত্রা করেন। ছাত্র অবস্থায় তিনি একবার মাত্র প্যারীনগরে কয়েকদিন কাটিয়েছিলেন।

ভারতে ফিরে গান্ধী বম্বেতে এক বাসা ভাড়া করেন, একটি ঠাকুরও রাখেন। প্রতিদিন হাইকোর্টে গিয়ে কিভাবে মামলা চালান হয় তা লক্ষ্য করতেন, আদালতের পুস্তকাগারে কয়েক ঘণ্টা আইনের বই পড়তেন। এভাবে তিনি তাঁর ভারতীয় আইনজ্ঞানের অভাব পুরিয়ে নিচ্ছিলেন। প্রথম এক অতি সহজ মামলা হাতে এল, পারিশ্রমিক তার ৩০্ টাকা। আদালতে দাঁড়িয়ে সওয়াল জবাব করতে গিয়ে বাইশ বছরের অনভিজ্ঞ নবীন ব্যারিস্টার কাবু হয়ে পড়লেন, ভয়ে তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল, তালু শুকিয়ে গেল। ব্যর্থ হয়ে তিনি পরম লজ্জায় আদালত ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। তারপর সে আদালতে আর মামলা চালাননি।

তাঁর ব্যয় বাড়তে থাকল অথচ আয় রইল শূন্যের অঙ্কে। দলিল মুসাবিদা করায় তাঁর হাত পাকা হয়ে উঠল কিন্তু ওটা না ছিল ব্যারিস্টারের কাজ আর না আনত যথেষ্ট টাকা। অন্য উকীলের আইনী তর্কবিতর্ক বুঝতে না পারলে তিনি আদালতে বসে ঝিমোতেন। আরো বহু বেকার ব্যারিস্টার তখন এই কর্ম করত। ছ' মাস বৃথা চেষ্টার পর গান্ধী বম্বের বাসা তুলে দিয়ে রাজকোটে দাদার কাছে চলে গেলেন, স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে মিলিত হলেন। বিলেতফেরৎ ব্যারিস্টার ভাইয়ের পসারের সাফল্যে দাদা আস্থা রেখেছিলেন, সে আশায় ছাই পড়ল, ভাইও মনমরা।

রাজকোটে আর এক সমস্যা দেখা দিল। যে সব উকীল মামলা আনত, রেওয়াজমাফিক তাদের কিছু আয়ের বখরা দিতে হত। এভাবে টাকা দেওয়া ঘুষের নামান্তর বলে গান্ধীর ও কাজ করায় বিশেষ আপত্তি ছিল। দাদার পীড়াপীড়িতে ভাইকে মতভার ক্ষেত্রে রফা করতে হল, তিনি বখরা দিতে আরম্ভ করলেন। এভাবে তিনি মাসে শ' তিনেক টাকা উপায় করতে থাকলেন। এ কাজ তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না, আশপাশের কুচক্রী আবহাওয়ায় তিনি হাঁপিয়ে উঠেছিলেন।

ভাগ্যবশত তিনি অচিরে এক আফ্রিকাবাসী ভারতীয় মুসলমান

বণিকের কাছ থেকে একটি মামলার কাজের ভার পান। বছর খানেক দক্ষিণ আফ্রিকায় থেকে মকদ্দমা তদ্বির করার ডাক আসে। সবশুদ্ধ তিনি ১৫০০ টাকা, খাওয়া-থাকার খরচ আর যাতায়াতের জন্য প্রথম শ্রেণীর জাহাজ ভাড়া পাবেন স্থির হয়। গান্ধী সে কাজ করতে রাজী হন, আবার সাগর পাড়ি দিয়ে আর এক দূর মহাদেশে যাত্রা করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার চালচলন সম্বন্ধে তখন তাঁর কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না।

জলপথে যাত্রাকালে জানজিবারে জাহাজ নোঙর করামাত্র গান্ধী সেখানকার আদালতের কাজকর্ম কিভাবে চলে দেখতে গেলেন। হিসেব লেখা সম্পর্কে বহু জিজ্ঞাসাবাদ তিনি বুঝতে পারছিলেন না, ও ব্যাপারে তিনি অজ্ঞ ছিলেন অথচ তিনি যে মামলার জন্য প্রবাসে যাচ্ছিলেন তাতে হিসেবকিতেবের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল জেনে তিনি পরে হিসেবরাখার বই কিনে পড়ে নিয়েছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে পা দিয়েই গান্ধী লক্ষ্য করেছিলেন যে সাহেবরা কালাআদমী ভারতীয়দের ঘৃণার চোখে দেখে, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, "কুলি" বলে ডাকে। ডার্বানে পৌঁছবার তিন দিন পরে তিনি আদালতে যাবামাত্র সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম করলেন, "পাগড়ি খোল।" গান্ধী সে হুকুম তামিল না করে আদালত ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। তাঁরও "কুলি ব্যারিস্টার" নামকরণ হয়। এসব অসম্মানে তাঁর মন বিচলিত হয়ে পড়েছিল।

মক্কেল দাদা আব্দুল্লার কাছ থেকে গান্ধী মামলার খুঁটিনাটি জেনে নিয়ে ভালভাবে তদন্তবিচার করতে লেগে গেলেন। তিনি বুঝলেন যে এভাবে যদি দু'পক্ষ দীর্ঘকাল মামলা চালায় তো উকীল-এটর্নীর পেট ভরাতে তারা দেউলে হয়ে যাবে। মক্কেল ঠকিয়ে টাকা কামাবার লোভ তাঁর ছিল না। বাদীবিবাদীর ঝগড়া আপসে মিটিয়ে দিয়ে মিল ঘটিয়ে দেওয়াই আইনজীবীর কর্তব্য বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি অপর পক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করে বিবাদ মেটাবার প্রস্তাব করায় দাদা আব্দুল্লাকে দ্বিধা করতে দেখে বলেন, "আপনি কিছু

ভাববেন না। আমাদের গোপন কথা আমি ফাঁস করে দেব না। আমি শুধু বিপক্ষকে মিটমাট করতে বলব।"

গান্ধীর মধ্যস্থতা ও সন্ধির প্রস্তাবসত্ত্বেও সে মামলা এক বছর চলে। ফলে নিপুণ আইন ব্যবসায়ীরা গোলমেলে মকদ্দমা কিভাবে পরিচালনা করেন তা জানার সুযোগ গান্ধী পান, মামলা সাজাতে ও নজীর দাখিল করতে শেখেন। মামলা মিটল, দু'পক্ষ খুশী হল কিন্তু গান্ধীর মনে শান্তি নেই। দু'দলই আইনের মারপ্যাঁচ দেখিয়ে নিজপক্ষকে ন্যায়বাদী বলে সমর্থন করতে পারে আর মামলার খরচা বাড়িয়ে মক্কেল ফাঁসাতে পারে দেখে তাঁর নিজ পেশার প্রতি বিরাগ জন্মাল।

ঐ কাজে এক বছরের অভিজ্ঞতা গান্ধীর মনে আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছিল। কিছু বাদবিতণ্ডার পর এই 'কুলি ব্যারিস্টার'টি নাতাল উচ্চ আদালতে আইনজীবী হিসেবে কাজ করার অধিকার লাভ করেন। মাস তিনেক পরে বালসুন্দরম্ নামে এক দুস্থ সহায়সম্বলহীন গিরমিটিয়া মজুর এটর্নী গান্ধীর দপ্তরে এসে হাজির হয়। তার পরনের কাপড় ছিন্নভিন্ন, সামনের দুটি দাঁত ভাঙা ও রক্তাক্ত মুখ দেখে কি ঘটেছে প্রশ্ন করে গান্ধী জানতে পারেন যে তার সাহেব মনিব তাকে মেরে ঐ দশা ঘটিয়েছে। তাকে আশ্বস্ত করে, চিকিৎসার জন্য তাকে এক সাহেব ডাক্তারের কাছে গান্ধী পাঠিয়ে দেন। সে ডাক্তারের কাছ থেকে বালসুন্দরমের আঘাত ক্ষত গুরুতর তার জবানবন্দীও লিখিয়ে নেন। তারপর সে মালিকের নামে নালিশ করেন। অবিলম্বে সুবিচার মেলে। গান্ধী বালসুন্দরম্‌কে অন্য এক চেনা সাহেবের কাজে লাগিয়ে দেন। এ ঘটনার পর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার সকল দুঃখী কুলিমজুর গান্ধীকে অশরণের শরণ বলে জেনেছিল। সুদূর ভারতেও তাঁর এই সৎসাহস ও দুস্থপ্রীতির খ্যাতি পৌঁছে গিছল।

সাহেব এটর্নীরা গান্ধীকে কোনও মামলা সঁপে দিয়ে সাহায্য করত না তবু তাঁর পসার জমে ওঠে। গান্ধী নিজে দু'চারটি বাধা সৃষ্টি করে মকদ্দমা করে বেশী আয় করার সুযোগ নষ্ট করেছিলেন। আইনজীবীর

পেশা যে মিথ্যেবাদীর ধান্ধা নয় তা প্রমাণ করার জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। মামলা জেতার জন্য তিনি কখনও মিথ্যা বলেননি, কখনও কোনও মিথ্যা সাক্ষীকে শিখিয়ে পড়িয়ে আদালতে হাজির করেননি। মক্কেলের হারজিৎ যাই ঘটুক না কেন তিনি তাঁর নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক ছাড়া এক পাই বেশি নিতেন না। বকেয়া পাওনা টাকার জন্য কোনও মক্কেলকে তাগাদা দিতেন না, ব্যক্তিগত কারণে কখনও কাউকে আদালতে টেনে নিয়ে গিয়ে বিচার চাননি। দক্ষিণ আফ্রিকায় বিরূপ মানুষরা চার বার তাঁর ওপর হামলা করেছিল, তাঁকে মারপিট করেছিল। গান্ধী তাদের একজনকেও ফৌজদারীর দায়ে দোষী করে নালিশ রুজু করেন নি। তাঁর বিশবছরব্যাপী আইন ব্যবসাকালে তিনি শত শত মানুষকে আদালতের শরণ না নিয়ে আপসে ঝগড়া মিটিয়ে নিতে সাহায্য করেছিলেন।

একদা মামলা চালাতে চালাতে তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁর মক্কেল জোচ্চুরি করেছে। আর তার পক্ষ সমর্থন না করে তিনি তৎক্ষণাৎ ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলা খারিজ করে দিতে অনুরোধ করেন। মক্কেলকে খুব ধমক দেন। তিনি একদা বলেছিলেন, "আমি মাঝারি যোগ্যতা-সম্পন্ন আইনজীবীরূপে কাজ শুরু করি। আমার মক্কেলরা আমার আইনী বিতর্কবুদ্ধি দেখে আকৃষ্ট হয়নি, তারা আমার অবিচল সত্যনিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হয়ে আমার ওপর পূর্ণনির্ভর করত।" গান্ধীর কালা ও ধলা মক্কেলের অনেকে তাঁর পরম বন্ধু ও সহকর্মী হয়েছিল। তাঁর সততার এমন সুনাম রটেছিল যে একবার তাঁর মধ্যস্থতায় এক মক্কেল হাতে হাতকড়া পরা থেকে রেহাই পেয়েছিল। সেই পুরানো বৃদ্ধ মক্কেলটি ন্যায্য শুল্ক না দিয়ে চোরাই মাল আমদানি করেছিল। পরে বিপৎকালে মানমর্যাদা খোয়াবার ভয়ে গান্ধীর কাছে অকপটে সব দোষ স্বীকার করে সাহায্য চায়। গান্ধী তাকে সত্য কথা বলে সাজা নেবার জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। প্রধান এটর্নী ও শুল্ক সংগ্রাহকের কাছে গান্ধী সত্য ঘটনা জানান। তাঁর বিবৃতিতে

বিশ্বাস করে তারা দোষীকে জরিমানা করে ছেড়ে দেয়। কৃতজ্ঞতাবশে ঐ মক্কেলটি সে ঘটনার বিশদ বিবরণ ছাপিয়ে নিজ দপ্তরে টাঙিয়ে রেখেছিল।

আর একবার গান্ধীর মক্কেলের খাতায় ভুল খরচের নিশানা পেয়ে গান্ধী বিপক্ষকে তা জানার সুযোগ দেন। গান্ধী ঠকামির আশ্রয় নিয়েছেন ভেবে জজসাহেব প্রথমে চাপ দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু পরে গান্ধীর সত্যনিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে বিপক্ষকে বলেছিলেন, "মিঃ গান্ধী স্বেচ্ছায় এ ভুল স্বীকার না করলে তুমি কি করতে?"

গান্ধী সওয়াল করায় বেশ পাকা ছিলেন। জজসাহেবরা এবং আইনজীবী সহকর্মীরা তাঁকে সমীহ করত। বহু সাহেব মক্কেল তাঁর পরামর্শ নিত। গান্ধী লক্ষ্য করেছিলেন যে ভারতে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রে ভারতীয়রা ন্যায়বিচার পেত না। দুঃখক্ষোভে বলেছিলেন, "ভারতে জঘন্যতম খুনের দায়ে কি একটিও ইংরেজ কঠিনতম সাজা পেয়েছে? নির্দোষ নিগ্রোদের ওপর ইচ্ছাপূর্বক পাশবিক অত্যাচারপীড়ন করা সত্ত্বেও ইংরেজ কর্মচারীদের খেলাচ্ছলে সাজা দেওয়া হয়।"

ন্যায়নিষ্ঠার এত বিধিনিষেধ মানা সত্ত্বেও গান্ধীর কাজের চাপ বেড়েই গিছল। ভারতে তিনি অল্পকাল ব্যারিস্টারি করেছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশ বছর আইন ব্যবসায় চালিয়েছিলেন। চারজন কেরানী ও টাইপিস্ট মিলে তাঁর কাজে সামাল দিতে পারত না। প্রথম জীবনে তিনি ভাল এলাকায় বাসা ভাড়া করে উদীয়মান ব্যারিস্টারের যোগ্য কেতামাফিক বিলিতীঢঙে তা সাজিয়েছিলেন। প্রতি ছুটির দিনে আর রবিবারে তাঁর বাড়ীতে খাইখেলাই হত। তাঁর ঘরের দ্বার অবারিত ছিল। তিনি বন্ধু ও বেতনভুক অধস্তন কর্মীদের নিজবাড়ীতে থাকতে দিতেন। বাড়ী থেকে পাঁচ ছ' মাইল দূরে তাঁর দপ্তর ছিল। কয়েক মাস সাইকেল চড়ে যাতায়াত করার পর তিনি পায়ে হাঁটা শুরু করেন। নির্দিষ্ট ঠাঁই ছাড়া ভারতীয়দের অন্য আসনে বসার হক ছিল না বলে

তিনি ট্রামে চড়তেন না। নামডাকের খাতিরে বিশেষ সুযোগ ভোগ করার সুবিধা তিনি কখনও কাজে লাগাননি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি ধীরে ধীরে দুঃখী ভারতীয় মজুরদের সঙ্গে একাত্ম হবার চেষ্টায় অতি সাদাসিধেভাবে থাকার অভ্যাস চালু করেন। চল্লিশ বছর বয়সে, যখন তিনি মাসে গড়ে ৪০০০ টাকা আয় করছিলেন তখন আইনব্যবসায়ে ইস্তফা দেন। জনসাধারণের সেবায় মন দেন। তাঁর যা কিছু ধনসম্পত্তি ছিল তা জাতীয় ভাণ্ডারে দান করে শ্রমসাধ্য কাজ করে আশ্রমে বাস করতে আরম্ভ করেন।

বহুবছর পরে ভারতে উকীল ব্যারিস্টারদের মোটা পারিশ্রমিক নেওয়ার কুপ্রথা দেখে গান্ধী নিন্দা করেন। কী খরচা করে আদালতের কাজ চলে অথচ ভারতবাসীরা কত গরীব! একজন আইনজীবী ইচ্ছা করলে মাসে ৫০,০০০ থেকে ১০০,০০০ টাকা রোজগার করতে পারে দেখে বলেছিলেন, "এ যেন ফটকা খেলা। আমরা যদি এভাবে আইনজীবী আর আদালতের মোহজালে জড়িয়ে না পড়ি তো অনেক সুখস্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারি। আইনজীবিকা দুর্নীতিময়, দু'পক্ষ শেখানো সাক্ষী খাড়া করে, সাক্ষীরাও অর্থলোভে আত্মবিক্রয় করে।" বিচার ব্যবস্থা ন্যায়শীল ও অল্পব্যয়সাধ্য করার জন্যে তিনি আইন আদালতের বিশেষ হেরফের ঘটানো দরকার মনে করতেন। তিনি নিজে বিনা-মজুরিতে গরীবদের মামলার তদ্বির করতেন। দশের হিতার্থে যে মামলা চালাতেন তা থেকে বাড়তি লাভ না করে, যেটুকু ন্যায্য খরচ হত তাই নিতেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় সরকার যখন গরীব ভারতীয়দের কুলিবস্তি থেকে উচ্ছেদ করে দিচ্ছিল তখন গান্ধী তাদের পক্ষ নিয়ে মামলা করেন। প্রতিটি মামলা খেটে তৈরী করা সত্ত্বেও তিনি মামলা পিছু মাত্র ১৭০ টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন। সত্তরটি মামলার মধ্যে মাত্র একটিতে তাঁর হার হয়েছিল। সে আয়ের অর্ধেক টাকা গান্ধী দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে সঁপে দিয়েছিলেন।

ভারতীয়দের পক্ষ নিয়ে মানুষের মতো বাঁচার অধিকার দাবি

করে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় সরকারের সঙ্গে বিরোধ করেছিলেন। ফলে তাঁকে বহুবার বন্দী হয়ে কয়েদ খাটতে হয়েছিল। ভারতের এবং দক্ষিণ আফ্রিকার আদালতে তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার যে আদালতে তিনি দশ সাল সসম্মানে ব্যারিস্টারি করেছিলেন, সেখানে হাতকড়া লাগানো অবস্থায় হাজিরা দিতে হয়েছিল। ব্যারিস্টারের নামছাপা খাতা থেকে তাঁর নাম কাটা পড়েছিল, আইনত পসার করার হক বাতিল হয়ে গিছল।

গান্ধী বৃটিশরাজের আদালতের সঙ্গে অসহযোগ ঘোষণা করেন, পঞ্চায়েৎরাজ চালু করার প্রস্তাব করেন। এই আইনভাঙা মানুষের ডাকে দেশের বহু গণ্যমান্য উকীল মোক্তার ব্যারিস্টার আইন ব্যবসায়ে ইস্তফা দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল। সত্যাগ্রহীরা আত্ম-পক্ষ সমর্থনের জন্য আদালতের শরণ নেয়নি।

আইনসভার তরফ থেকে গান্ধীকে একবার মানপত্র উপহার দেওয়া হয়; তার উত্তরে গান্ধী বলেছিলেন, "ব্যারিস্টারের তালিকা থেকে বহুপূর্বে আমার নাম মুছে গেছে। আইন আমি ভুলে গেছি। আইন ব্যাখ্যা করার চেয়ে ইদানীং বেআইনীভাবে আইন অমান্য করায় আমি বেশী রত আছি।"

দক্ষ দর্জি

দক্ষিণ আফ্রিকায় জেলে বন্দী অবস্থায় সাজাহিসেবে গান্ধীর ভাগে জামার পকেট কাটার আর ছেঁড়া কম্বলের টুকরো জোড়ার কাজ মিলেছিল। প্রতিদিন ন' ঘণ্টা সেলাই করতে হত। গান্ধী কাজে ফাঁকি দিতে বা কাজের সময় বিশ্রাম নিতে জানতেন না। তিনি চটপট কাজ সেরে আরো ছেঁড়া কম্বল চাইতেন।

ভারতের জেলেও কিছুদিন তিনি সখ করে নিয়মিতভাবে সিঙ্গার কলে সেলাই করেছিলেন। এভাবে তিনি কল চালাবার অভ্যাস পাকা করে নিচ্ছিলেন। যেসব কলকব্জা গড়তে অনেক ধন লাগে এবং যেসব যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে মানুষ হাতের কারিগরির নিপুণতা হারিয়ে ফেলে এবং গরীব শ্রমিকেরা পুঁজিপতি মালিকের দাস হয়ে পড়ে, গান্ধী তার প্রচারের বিরোধী ছিলেন। তিনি ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকের আয়েস আরাম অবসরের ব্যবস্থা ঘটানোর চেয়ে বেকার মানুষের অকেজো সময় অর্থকরী কাজে লাগাবার পক্ষপাতী ছিলেন। তবু সেলাইকলের সমর্থক ছিলেন এজন্য যে তাঁর মতে—"এটি একটি বিশেষ দরকারী কাজের যন্ত্র। এর আবিষ্কারের মূলে মমতাময় পরিকল্পনা জড়িয়ে আছে। সিঙ্গার সাহেব লক্ষ্য করেছিলেন যে তাঁর স্ত্রী হাতে সেলাই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন! স্ত্রীর এই অতিরিক্ত খাটুনি কমাবার আগ্রহে তিনি সেলাই কল উদ্ভাবন করেছিলেন। অনেক টাকা মুনাফা করার লোভের বদলে ব্যক্তিগত শ্রম লাঘব করা তাঁর লক্ষ্য ছিল।"

গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় সাহেবী ঢঙের পোশাক পরতেন কিন্তু ভারতে ফিরে ধুতিকোর্তা পরা শুরু করেন। নিজের পরনের কাপড়ের সুতো তিনি চরকায় কাটতেন, সে সুতো তাঁতে বুনতেন এবং সেই খদ্দরের কামিজ নিজে সেলাই করতে পারতেন। তাঁকে লোকচক্ষে হেয় করার জন্য এক সাহেব কাগজে লিখেছিলেন যে গান্ধী চাষীদের মন জয় করার উদ্দেশ্যে দিশী ধাঁচের ধুতিকোর্তা পরতে আরম্ভ করেছেন। গান্ধী চটপট পাল্টা জবাবে বলেছিলেন, "এ একেবারে মিথ্যে রটনা। স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করার ব্রত নেবার পর থেকে আমি তাঁতে বোনা ধুতি-কামিজ পরছি এবং সে কামিজ নিজে হাতে সেলাই করি।" গান্ধী কস্তুরবার জামাও সেলাই করতে পারতেন। তাঁর হাতে-করা খাদি কামিজ ওয়ার্ধা আশ্রমে আছে।

তাঁর হাতের সেলাই ভাল ছিল এবং সেজন্য তাঁর মনে গর্বও ছিল। এক বিদেশিনী আশ্রমবাসিনীকে একদা লিখেছিলেন—"তোমার পাঞ্জাবী-ঢঙের পোশাক (সালোয়ার কামিজ) সেলাইয়ের ব্যাপারে চিন্তিত হয়ো না। একটা সিঙ্গার কল চেয়ে এনে সহকর্মীর সাহায্যে আমি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তোমার দরকারী পোশাক সেলাই করে দেব।" দর্জিদের সঙ্গে তাঁর এমন মিতালি ছিল যে তারা বিনামজুরিতে তাঁর আশ্রমে কাটছাঁট ও সেলাই শেখাত।

ধুতিপাঞ্জাবি ছেড়ে যখন গান্ধী খাটো খাদি থান আর চাদর পরা শুরু করেছিলেন তখনও মাঝে মাঝে নিজের খদ্দরের রুমাল, গামছা বা থানের কিনারে হাতে মুড়ি সেলাই দিয়ে নিতেন। কখনও বাঁ হাতে ছুঁচ চালাতেন আর মুখে সেক্রেটারিকে চিঠির বয়ান বলে যেতেন। আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী অবস্থায় জেলের কর্তার জন্মদিনে তিনি কয়েকটি খাদি রুমাল উপহার দিয়েছিলেন। চুয়াত্তর বছরের এই কয়েদী দর্জি চোখে চশমা এঁটে প্রতি রুমালের কোণে নামলেখার নক্সাকাজ করেছিলেন।

গান্ধীর একটা পছন্দসই পশমী শাল ছিঁড়ে গিয়েছিল। সেটি

কিভাবে খদ্দর মুড়ে জোড়াতালি দিয়ে ব্যবহার করা যায় তার পরামর্শ দিয়ে গান্ধী এক ভক্ত শিষ্যাকে দিয়ে সেটি মেরামত করিয়ে নিয়েছিলেন। ভারতের দুঃখী চাষীমজুরের প্রতিনিধিরূপে তিনি সেই শাল গায়ে দিয়ে বিলেতের গোলটেবিল বৈঠকে হোমরা-চোমরা সাহেব মন্ত্রীদের পাশে বসে আলাপ আলোচনা চালিয়েছিলেন। ঐ শাল গায়ে দিয়ে তিনি সম্রাট পঞ্চম জর্জের চায়ের আসরে নিমন্ত্রণ রাখতে গিছলেন। তালিমারা কাপড় চাদর পরায় তাঁর কুণ্ঠাবোধ হত না কিন্তু ছেঁড়া নোংরা ঝলঝলে বেশবাস তিনি সইতে পারতেন না। এক সভায় তাঁর চেনা এক কর্মী খদ্দরের ছেঁড়া চাদর জড়িয়ে বসেছিলেন। সেদিকে নজর পড়ামাত্রই গান্ধী একটুকরো কাগজে লিখে পাঠালেন, "তোমার চাদরের ফুটো আমি তারিফ করতে পারলুম না। এটা গরীবানার লক্ষণ নয়। হয় তোমার ঘরে স্ত্রী নেই, নয় তিনি বেজায় কুড়ে আর অগোছাল।"

ধৈর্যবান ধোপা

ব্যারিস্টার গান্ধী একদা চোস্ত কাটছাটের পরিচ্ছন্ন পোশাক পরতেন, প্রতিদিন একটা ধোপভাঙা কলার পরে আদালতে যেতেন, একদিন অন্তর সার্ট বদল করতেন। ফলে ধোপা খরচ খুব বেশী লাগত। ধোপারা সময়মতো জামাকাপড় কেচে আনত না, দেরি করত, সেজন্য গান্ধীকে বহু বাড়তি জামা পোশাক কিনে রাখতে হত। গণ্ডা দশেক সার্ট ও ততোধিক কলার থাকা সত্ত্বেও ফর্সা সার্টের টানাটানি পড়ে যেত। গান্ধী এই বাড়তি খরচ কমাবার এক উপায় ঠাওরালেন। একদিন কাপড় কাচার সরঞ্জাম কিনে বাড়ী ফিরলেন। কাপড় ধোলাই সম্পর্কে একটা বই কিনে পড়ে কাপড়কাচা সংক্রান্ত হদিস মেলার পর নিজে কাপড় কাচতে লেগে গেলেন। স্ত্রী কস্তুরবাকেও ধোলাইকর্ম শিখিয়ে দিলেন।

এই বাতিকের ফলে গান্ধীর কাজের বোঝা ভারী হল তবু স্বাবলম্বী হবার আগ্রহে তিনি নাছোড়বান্দা। ধোপার খামখেয়ালীর দাসত্ব তাঁর অসহ্য বোধ হচ্ছিল। প্রথম দিন একটা কলার কেচে, মাড় দিয়ে শুখিয়ে নিলেন। ইস্ত্রি করার অভ্যাস ছিল না, পুড়িয়ে ফেলার ভয়ে সাবধানে অল্প তাতানো যন্ত্রে অল্প চাপ দিয়ে ইস্ত্রি-করা কলার গলায় এঁটে গান্ধী আদালতে গেলেন। শক্ত আড়ষ্ট কলার থেকে মাড় ঝরে পড়তে দেখে আদালতে হাসির ফোয়ারা ছুটল। গান্ধী একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে বললেন : "এ কাজে আমার হাতে খড়ি তাই মাড় বেশী হয়ে গেছে। আমার তাতে কিছু লোকসান হয় নি। তোমাদের

হাসির খোরাক জুগিয়েছি এও একটা মস্ত লাভ।" একজন প্রশ্ন করলেন, "বলি, এদেশে কি কাপড় কাচা ধোপাখানার অভাব ঘটেছে?" গান্ধী জবাব দিলেন, "না, ধোলাই খরচ বড় বেশী। একটা কলার কাচতে যা দক্ষিণা নেয় তাই দিয়ে নতুন কলার কেনা যায়। তাছাড়া ধোপার মর্জির ওপর নির্ভর করতে হয়। তার চেয়ে নিজের কাজ নিজে করব স্থির করেছি।"

কিছুকাল পরে গান্ধী পাকা ধোপা ব'নে গিছলেন এবং পেশাদার ধোপার মতো পরিপাটিভাবে নিজের জামা পোশাক কাচতে পারতেন।

গোখলে একবার দক্ষিণ অফ্রিকায় গান্ধীর অতিথি। গান্ধী গোখলেকে গুরুজ্ঞানে ভক্তি করতেন, ভালবাসতেন। এক মস্ত ভোজে গোখলের নিমন্ত্রণ ছিল। গোখলের প্রিয় গলাবন্ধটি কুঁচকে গিছল অথচ ধোপাবাড়ী থেকে কাচিয়ে আনার আর সময় ছিল না। গান্ধী তাঁকে শুধোলেন, "এটা আমি সুন্দরভাবে ইস্ত্রি করে দেব?" গোখলে বলে উঠলেন, "না বাপু, তোমাকে আমি ভাল ব্যারিস্টার বলে জানি। ধোপা হিসেবে তোমার যোগ্যতার ওপর আমার আস্থা নেই। যদি নষ্ট করে ফেল তো কি হবে। আমার কাছে এর কত দাম জান? আমার গুরু মহামতি রাণাড়ে এটা আমাকে উপহার দিয়েছেন, এ তাঁর স্মৃতিচিহ্ন।" জিদ করে গান্ধী সেটা ইস্ত্রি করেন। তাঁর হাতের পরিচ্ছন্ন কাজ দেখে গোখলে সাবাস জানান। গান্ধী মহাখুশী, বললেন, "এর পর যদি সারা জগৎ আমার ধোপাগিরির তারিফ না করে তো আমি কিছু পরোয়া করি না।"

দক্ষিণ আফ্রিকার আশ্রমেও তিনি কিছুকাল ধোপাগিরি করেছিলেন। আশ্রমে জলের অভাব ছিল, দূরে গিয়ে ঝর্ণার জলে কাপড় ধুতে হত। মেয়েদের কষ্ট কমাবার জন্যে গান্ধী তাদের কাপড় কাচার সঙ্গী হতেন। তিনি "মহাত্মা" হবার পর কাজের চাপ এত বেশী থাকত যে নিয়মিত ধোপার কাজ করতে সময় পেতেন না, মাঝে-সাঝে হাত লাগাতেন। যখন তিনি প্রথম খদ্দর প্রচার শুরু করেন তখন খদ্দরের শাড়ী খুব

মোটা আর ভারী হত। আশ্রমের মেয়েরা যদি বা খাদি শাড়ী পরতে রাজী হত তো তা কাচতে গিয়ে হিমসিম খেত, নালিশ জানাত। গান্ধী তাদের আশ্বাস দিয়ে বলতেন, "ঘাবড়াচ্ছ কেন? আমি তোমাদের ধোপা হব, শাড়ী কেচে দেব।"

অন্যের কাপড় কাচায় তাঁর কিছু ঘেন্না বা লজ্জা ছিল না। দিল্লীতে এক ধনী শেঠের বাড়ী অতিথি হয়ে, স্নান ঘরে গিয়ে গান্ধী দেখেন যে শেঠজী সদ্য স্নান সেরে গেছেন, মেঝেতে তাঁর ছাড়া ধুতি পড়ে আছে। স্নানান্তে নিজের ও শেঠজীর কাপড় কেচে গান্ধী রোদে শুকোতে দিলেন। রোদ রোগের পোকা নষ্ট করে আর সাদা কাপড় ঝকঝকে করে ব'লে গান্ধী রোদে কাপড় মেলতে পছন্দ করতেন। বাড়ীর কর্তা হঠাৎ সেখানে এসে গান্ধীর কাণ্ড দেখে অপ্রস্তুতভাবে নালিশ জানালেন, "বাপুজী, আপনি এ কী করেছেন?" গান্ধী সহজ গলায় বললেন, "তাতে কি হয়েছে। ফর্সা কাপড় মাটিতে লুটোচ্ছিল। পা লেগে নোংরা হয়ে যেত তাই কেচে এনেছি। সাফাইয়ের কোন কাজ করতে আমার লজ্জাবোধ হয় না।" লজ্জা গান্ধী পাননি কিন্তু শেঠজী পেয়েছিলেন।

প্রৌঢ় বয়সে জেলে বন্দী থাকার সময় গান্ধী অনেক সময় সহকর্মীদের কাজ কমাবার জন্যে নিজের ছোট্ট কাপড়, গামছা রুমাল নিজে কেচে নিতেন। জেলে অসুস্থ কস্তুরবার শেষ অসুখের সময় গান্ধী স্ত্রীর মুখমোছা ময়লা লাগা রুমাল ধুয়ে দিতেন।

গান্ধী চিরকাল খুব ফিটফাট থাকতে ভালবাসতেন। বালক বয়সেও রাজকোটে কুয়োর জলে নিজের মিহি ধুতি কেচে আনতেন। কার কাপড় কত ফর্সা হয় এ নিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে পাল্লা দিতেন। তিনি সাদাসিদে জীবন ভালবাসলেও তেলময়লার দাগ লাগা মোচড়ান কাপড় জামা দেখলে অত্যন্ত বিরক্ত হতেন। নিজের কপনিটুকু, চাদর বা রুমাল নিদাগ নিভাঁজ রাখতেন। তিনি পরিচ্ছন্নতার প্রতিমূর্তি ছিলেন।

নিপুণ নাপিত

দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছবার সপ্তাহকাল পরে গান্ধীকে মামলার কাজে ডার্বান শহর থেকে অন্য এক শহরে যেতে হয়েছিল। সেখানে পৌঁছে একটা বড় হোটেলে গিয়ে গান্ধী থাকার ঘর চেয়েছিলেন। সাহেব ম্যানেজার তাঁকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত লক্ষ্য করে বলল, "বড় দুঃখিত, এখানে জায়গা নেই।" নিরুপায় হয়ে গান্ধী এক চেনা মানুষের দোকানে রাত কাটান। তাঁর ঐ কাহিনী শুনে একজন ভারতীয় হেসে বললেন, "আপনাকে ও হোটেলে থাকতে দেবে এ কি করে ভাবতে পারলেন?" গান্ধী অবাক হয়ে জবাব দিলেন, "কেন দেবে না?" জবাব পেলেন, "এখানে আরো কিছুদিন থাকলে সব বুঝতে পারবেন।"

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের যে কত অপমান সইতে হত তার লম্বা ফিরিস্তি গান্ধী পরে শোনেন এবং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে টের পান। কালা আদমী বলে সাহেবরা তাঁকে কিল চড় লাথি মেরেছিল, ধাক্কা দিয়ে ট্রেন থেকে, লাথি মেরে ফুটপাত থেকে ফেলে দিয়েছিল, বারবার অপমান করেছিল। তাঁকে কুলি-ব্যারিস্টার নাম দিয়েছিল তবু ভারতবাসী হওয়ার অপরাধে মানুষহিসেবে তাঁর সহজ অধিকার থাকবে না কেন এ কথা কিছুতে গান্ধীর মাথায় ঢুকত না। সাহেবদের খ্রীষ্টধর্ম নাকি প্রেমের ধর্ম!

সেদেশে চারবছর বাস করার পর যখন গান্ধী বেশ নামজাদা ব্যারিস্টার হয়ে গিছলেন তখন একটা সেলুনে চুল কাটতে যাবামাত্র

সাহেব নাপিত শুধোল, "কি চাই?" গান্ধী উত্তর করলেন, "চুল কাটাতে চাই।"

"তোমার চুল আমি কাটতে পারব না। কালাআদমীর চুল কাটলে আমার বদনাম হবে, খদ্দের কমে যাবে।"

এবার এ অপমানে গান্ধীর মনে বড় ঘা লাগল। বুঝলেন দুঃখে কাতর হলে হবে না, কাগজে নালিশ জানালে হবে না, স্বাবলম্বী হতে হবে। নিজের কাজ নিজে সামলাতে শিখতে হবে। সেদিন একটা চুলছাঁটা কল কিনে বাড়ী ফিরলেন, নিজের চুল নিজে কাটতে লেগে গেলেন। চুলছাঁটা ব্যারিস্টারের কাজ নয়। একে অনভ্যস্ত তায় মাথার পেছনদিক দেখা যায় না ফলে পেছনটা খুবলে খাবলে গেল। তিনি পরোয়া না করে আধখাপছান চুল নিয়ে পরদিন পোশাক পরে আদালতে গেলেন। তাঁর কিম্ভুতরূপ দেখে বন্ধুরা হেসে আকুল। একজন তামাসার সুরে জিগেস করল, "গান্ধী তোমার চুলের এ দশা কি করে হল? রাতে ইঁদুরে খেয়েছে না কি?"

গান্ধী জবাব দিলেন, "না, গোরা নাপিত কালো মানুষের কালো চুল ছুঁতে রাজী হয়নি তাই ভাবলুম যত খারাপই হোক না কেন নিজে চুল ছাঁটব।"

গান্ধীর ২৮ বছর বয়সে চুল কাটায় এই প্রথম হাতেখড়ি। তারপর এ নাপিতটি বহুবার সখ করে তাঁর আশ্রমের সঙ্গীদের চুল কেটে দিয়েছিলেন। আশ্রমে পেশাদার নাপিতের সাহায্য নেওয়া হত না; সঙ্গীরা পালা করে একে অন্যের চুল কেটে দিত। আশ্রমের পড়ুয়ারা যাতে সংযত কৃচ্ছ্রকঠোর জীবন কাটাতে শেখে সেদিকে গান্ধী [illegible] রাখতেন। তাদের আয়েসী বিলাসী হলে চলবে না। এক সকালে ছেলেরা জটলা করে নাইতে চলেছে। গান্ধী কোনও ভূমিকা না করে একের পর এক পড়ুয়াকে ধরে কদমছাঁট নেড়ামুণ্ডি করে দিলেন। অমন সখের টেরি নষ্ট হয়ে যাওয়াতে ছেলেরা মুষড়ে পড়ল। গান্ধী একদা আশ্রমের দুটি মেয়েরও লম্বা চুল কপচে দিয়েছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার কয়েদখানায় বন্দীদের চিরুনি দেওয়া হত না। যারা দু'মাসের বেশী সাজা পেত তাদের গোঁপ চুল কেটে ছেঁটে দেওয়া হত। গান্ধী ও তাঁর সহচরদের ওপর এ নিয়ম খাটানো হয়নি। জেল অভিজ্ঞতার পুরো ভাগীদার হবার জন্য স্বেচ্ছায় চুল কাটতে চেয়ে স্বাক্ষর করে দেন। তারপর তাঁকে কাঁচি দেওয়া হয়। গান্ধী ও তাঁর এক সঙ্গী রোজ দু'ঘণ্টা নাপিতগিরি করতেন।

আগার্খা প্রাসাদে গান্ধীর সঙ্গে আশ্রমবাসিনী এক মেয়ে ডাক্তার বন্দী ছিলেন। তার মাথায় খুস্কি হয়েছিল। তাঁর দুর্বুদ্ধি হল, গান্ধীকে বললেন, "বাপু, চুলগুলো কেটে ফেলে মাথায় ওষুধ দেব কি ?" গান্ধী বললেন, "হ্যাঁ কাটতে হয় তো এখনই কাটো, কাঁচি আন।" কাঁচি আসবামাত্র তার চুলের গোছা গান্ধী কেটে দিলেন। মহাত্মা নাপিতের বয়স তখন ৭৫ বছর।

স্বদেশী যুগে গান্ধী বিদেশী ক্ষুর বর্জন করে দেশী গ্রাম্য ক্ষুরে কামাতে আরম্ভ করেন। তাঁর আয়না, সাবান, বুরুশ কিছুই লাগত না। বোধহয় এভাবে কামানো তিনি বেশ বাহাদুরির কাজ মনে করতেন। একদা এক নাপিতকে প্রশংসাপত্রে লিখে দিয়েছিলেন, "মুন্নালাল পরম যত্নে আমাকে কামিয়ে দিয়েছে। সে দেশী ক্ষুর ব্যবহার করে আর সাবান ছাড়া কামাতে পারে।" তাঁর দেখাদেখি সদ্য বিলেতফেরৎ দু'একজন কর্মী ওভাবে কামাতে আরম্ভ করেন। শুধু জলের সাহায্যে কামাতে তাদের নাকি বেশী আরাম লাগত!

গ্রামের নাপিতরা কাঁটা তোলা, ফোড়া কাটা ইত্যাদি ব্যাপারে পাকা ডাক্তারের মতো সিদ্ধহস্ত জানা সত্ত্বেও গান্ধী নোংরামি ও জাত-মানার গোঁড়ামি বরদাস্ত করতে পারতেন না। সেবাগ্রামের আশ্রমের এক হরিজন কর্মী একদিন বলল, "আমি আজ চুল ছাঁটতে ওয়ার্ধা যাব।"

"কেন, এ গ্রামে চুল ছাঁটা যায় না ?"

"এ গ্রামে অচ্ছুৎ নাপিত নেই, সবর্ণ নাপিত আমার চুল ছাঁটবে

না" শোনামাত্র গান্ধী বললেন, "তাই বুঝি! তাহলে আমি আর কোনদিন ও নাপিতকে দিয়ে কাজ নিতে পারব না।" গান্ধীর কি দক্ষিণ আফ্রিকায় নিজ মনোবেদনার কথা স্মরণ হয়েছিল ?

দেশের মানুষ যাতে দেশের টাকা পরদেশকে না দিয়ে, গরীব মানুষের তৈরী খদ্দর ব্যবহার করে এই বাণী প্রচার করার জন্য গান্ধী দেশের প্রান্তে প্রান্তে সফর করেছিলেন। যখন এভাবে গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন, বড় ব্যস্ত থাকতেন, তখন তিনি নাপিতের সাহায্য নিতেন। একদিন ফরমাস করলেন যে খদ্দরপরা নাপিতের হাতে মাথা কামাবেন। সেবকরা খদ্দরধারী নাপিতের খোঁজে ছুটল। গান্ধী তাদের বলতেন, ধোপা-নাপিত এদের সবাইকে আমাদের স্বদেশী ব্রতের অংশী করে নিতে হবে। নাপিতরা খবর চালু করতে ওস্তাদ, ওরা ঘরে ঘরে স্বদেশীর বাণী পৌঁছে দেবে।"

নাপিতরা খুব ধূর্ত হয়। বিলেতের এক নাপিত গান্ধীকে বেকুব বানিয়েছিল। সেলুনে চুল ছাঁটাতে ছাঁটাতে গান্ধী কাজের কথায় বিভোর হয়েছিলেন এমন সময় সাহেব নাপিতটি তাঁকে কেশবর্ধক এক ওষুধ কিনতে বলে। গান্ধী অন্যমনস্কভাবে "আচ্ছা" বলেন। ব্যস, কিছুক্ষণ পরে তাঁর হোটেলের ঘরে এক শিশি এসে হাজির, তার মূল্য দিতে হল ২৫ টাকা! মোড়ক না খুলে গান্ধী সেটা তাঁর মেমবান্ধবীকে উপহার দিলেন। ভেবেছিলেন দামী বিলেতী কেশসজ্জা মেয়েদের কাজে লাগবে। আসলে সেটা ছিল টেকো মাথায় চুল গজাবার দাওয়াই। বান্ধবী যত হাসেন, বেকুব বনে গান্ধী তত বিরক্ত হয়ে ওঠেন।

নাপিতরা গান্ধীকে ভালও বাসত। খদ্দর প্রচারের কাজে যখন গান্ধী চাঁদা তুলছিলেন তখন সিংহলে এবং ভারতে নাপিতমণ্ডলী তাঁকে আলাদা টাকার তোড়া দিয়েছিল।

একবার নাপিত ডাকতে বলে গান্ধী কাজে মগ্ন আছেন। সহসা কানে মাকড়ি, নাকে নথ, হাতে খাড়ু ও গলায় হাঁসুলি পরা নাপতিনী

এসে হাজির। গান্ধী শুধালেন: "তুমি বুঝি আমায় কামাবে?" সে হেসে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে আপনমনে ক্ষুর শানাতে লাগল। হঠাৎ গান্ধী প্রশ্ন করলেন, "তুমি নাকে কানে হাতে এই জবড়জঙ ভারী গয়না পরেছ কেন? এতে তোমাকে মোটে সুন্দর দেখাচ্ছে না। রাজ্যের ময়লা জমে আছে এগুলোয়।" সে কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, "আপনার মতো মানী মানুষকে কামাব বলে আজ এগুলো ধার করে পরে এসেছি। আপনার কাছে কি আমি এমনি আসতে পারি?"

সে পরিপাটিভাবে গান্ধীর মাথা ও দাড়ি কামিয়ে দিয়ে, একটু হেসে তার পাওনা মজুরি গান্ধীর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে চলে গেল।

মহাভাঙ্গী

রাজকোটে গান্ধী পরিবারে উকা নামে মেথর কাজ করত। তাকে ছুঁয়ে ফেললে, গান্ধীর মা পুতলীবাঈ গান্ধীকে স্নান করতে বলতেন। গান্ধী মায়ের বাধ্য শান্ত আদুরে ছেলে হলেও মায়ের এ আদেশ তাঁর মনঃপূত হত না। বারো বছরের কিশোর সন্তান মাকে প্রশ্ন করত, "উকা মলজঞ্জাল সাফ করে আমাদের কত উপকার করে, তবে ওকে ছুঁলে দোষ হয় কেন?" তর্কচ্ছলে একথাও বলত, "রামায়ণে লেখা আছে যে রামচন্দ্র গুহকচণ্ডালকে মিত্র বলে কোল দিয়েছিলেন, ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে দেননি। রামায়ণে কি ভুল শিক্ষা দিতে পারে?" পুতলীবাঈ ছেলেকে কোনও সদুত্তর দিতে পারতেন না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধী মেথরের কাজে প্রথম হাত লাগান। সেখানে তিন বছর কাটিয়ে কস্তুরবা ও ছেলেদের নিয়ে যাবার জন্য তিনি ভারতে এসেছিলেন। তখন বম্বেপ্রদেশে প্লেগ মহামারী দেখা দিয়েছিল। রাজকোটে যাতে এ মারাত্মক রোগ ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য গান্ধী সাফাইসংস্কার কাজে যোগ দিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি বাড়ী পরিদর্শন করে তিনি পাইখানা সাফাইয়ের ওপর বেশী জোর দিয়েছিলেন। খাটা পাইখানার বড় দুরবস্থা ছিল; মলমূত্র একাকার হয়ে থাকত, ঘরে আলোবাতাস ঢুকত না, পোকা হাঁটত। ভদ্রপল্লীতে কোনও কোনও পরিবার একই নর্দমায় নাওয়া ধোওয়া শৌচ করত, বদগন্ধে সে মহল্লায় টেঁকা দুষ্কর ছিল। বাসিন্দারা এ অসুবিধা গ্রাহ্য

করত না। গরীব অচ্ছুতরা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ঘরে থাকত, সাফাই সম্বন্ধে পরামর্শ দিলে শুনত, তর্ক করত না। গান্ধী পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে দুটো আলাদা বালতিতে মল ও মূত্র ত্যাগের বুদ্ধি দেন। তার ফলে নোংরামি কিছুটা কমে যায়।

রাজকোটে গান্ধী পরিবারের নামডাক ছিল। গান্ধীর বাপ-ঠাকুর্দা দীর্ঘকাল রাজকোটে ও নাগোয়া দেশীয় রাজ্যে মন্ত্রীত্ব করেছিলেন। মোঢ়বানিয়ার মধ্যে গান্ধী সবপ্রথম বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে এসেছিলেন। প্রায় ৭০ বছর আগে এক দেওয়ানপুত্তুর ব্যারিস্টারের পক্ষে নিজের দেশে বাড়ী বাড়ী ঘুরে এভাবে সাফাইয়ের তদারক করা বড় সহজ কাজ ছিল না। আপৎকালে মনোবল প্রকাশ করায় গান্ধী কখনও পিছপাও হতেন না। তিনি পাশ্চাত্যের বহু রীতিনীতির কড়া সমালোচক হলেও সাফাইয়ের বোধ পশ্চিমের কাছে শিখেছিলেন একথা বারবার স্বীকার করতেন। সেই সাফাই পদ্ধতি তিনি ভারতে চালু করতে উৎসুক ছিলেন।

ক'বছর পরে যখন গান্ধী দ্বিতীয়বার স্বদেশে আসেন তখন কলকাতায় কংগ্রেসের সভা বসেছিল। সেই সভায় দেশের লোকের কাছে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের কি রকম দুঃখদুর্গতি সইতে হয় তা জানাবার জন্য গান্ধী কংগ্রেস শিবিরে গিয়েছিলেন। সেখানে পরিচ্ছন্নতার বিশেষ অভাব ছিল। কেউ কেউ ঘরের সামনের বারান্দায় শৌচাদি করত। অন্যরা সেই দুর্গন্ধ ও নোংরামি সহ্য করে নিয়েছিল, গান্ধীর মহা অস্বস্তি হতে লাগল। স্বেচ্ছাসেবকদের সেদিকে নজর দিতে বলায় তারা বলেছিল, "এ আমাদের কাজ নয়, মেথরের কাজ।" সাহেবী পোশাকপরা গান্ধী একটা ঝাঁটা চেয়ে নিয়ে ময়লা সাফ করতে লেগে গেলেন। তাঁর কাণ্ড দেখে স্বেচ্ছাসেবকরা তাজ্জব বনে গিছল কিন্তু কেউ সে কাজে হাত লাগায় নি।

বহুবছর পরে গান্ধী কংগ্রেসের কর্ণধার হবার পর, কংগ্রেস শিবিরে একদল স্বেচ্ছাসেবক ভাঙ্গীর কাজ করত। এক অধিবেশনে কেবলমাত্র

ব্রাহ্মণরা এ কাজ করেছিল। হরিপুরা কংগ্রেসে সাফাই করার জন্য দু'হাজার শিক্ষক ও পড়ুয়া মেথরগিরির তালিম নিয়েছিল। ময়লা সাফ করার জন্য মেথর নামে এক জাত থাকবে আর সবাই তাদের অস্পৃশ্য অশুচি বলে ঘৃণা করবে এ কুপ্রথা গান্ধী বরদাস্ত করতে পারতেন না। তিনি ভারত থেকে অস্পৃশ্যতা লোপ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন যে মায়েরা যেমন আমাদের মলমূত্র সাফ করে আমাদের সেবা করেন, মেথররাও তেমনই সমাজের সেবা করে, কল্যাণ করে।

ভারতীয়দের নোংরা চালচলন ও অভ্যাসের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় সাহেবরা তাদের ঘৃণা করত। গান্ধী তাদের ঘর দোকান দেখে এসে তাদের পরিচ্ছন্ন হতে বলেছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি জনসভায় এবং খবরের কাগজে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর সাহেব বন্ধুরা তাঁকে আদর করে মহাভাঙ্গী খেতাব দিয়েছিল।

তাঁর ডার্বানের বাসা বিলেতী ঢঙে তৈরী ছিল। কলঘরে নালা ছিল না। বিভিন্ন পাত্রে মলমূত্র ত্যাগ করতে হত। তাঁর সঙ্গে তাঁর অধীনস্থ যে সব কেরানী থাকত, দরকার হলে, গান্ধী তাদের প্রস্রাব-পাত্রও পরিষ্কার করতেন। শুধু নিজে করে ক্ষান্ত হতেন না, স্ত্রী-পুত্রদের দিয়েও করাতেন। কস্তুরবাকে একবার গোমড়ামুখে নীচুজাতের কেরানীর প্রস্রাবপাত্র নিয়ে যেতে দেখে গান্ধী খুব বকে ছিলেন। সবরমতী আশ্রমে অচ্ছুত পরিবারকে ঠাঁই দিয়েছিলেন বলে তাঁর হিতৈষী বন্ধুরা তাঁকে একঘরে করেছিল, অর্থসাহায্য বন্ধ করেছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকার জেলে তিনি একবার স্বেচ্ছায় ভাঙ্গীর কাজ করেছিলেন, পরের বার সাজাহিসেবে তাঁকে সে কাজ করতে হয়েছিল।

বিশবছর প্রবাসবাসের পর, ৪৬ বছর বয়সে গান্ধী স্ত্রী-পুত্র দলবল নিয়ে দেশে আসার পরই হরিদ্বারে কুম্ভমেলা দেখতে গিছলেন।

তীর্থযাত্রার ভীড় হয়েছিল অথচ সাফাইয়ের সুব্যবস্থা ছিল না তাই গান্ধী তাঁর শিষ্যদল নিয়ে কুম্ভে ভাঙ্গীর কাজ করেছিলেন। সেই বছরই তিনি তাঁর হিতৈষী গোখলের প্রতিষ্ঠিত সমাজ সেবকদের পুনার আস্তানা দেখতে যান। একদিন সকালে গান্ধীকে সেখানকার পাইখানা সাফ করতে দেখে গণ্যমান্য সভ্যরা ঘাবড়ে গিছলেন। এরকম দুঃসাহসী উদ্ভট-খেয়ালী কাজের মানুষকে সেবাদলের সভ্য করলে গোল বাধবে বুঝে তারা তাঁকে দলে নেয় নি। এ কাজ তারা অপছন্দ করলেও গান্ধী জানতেন যে এসব কাজে পটুত্বের মধ্যেই প্রকৃত স্বরাজের চাবিকাঠি আছে।

গান্ধী একাধিকবার ভারত ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি সর্বত্র নোংরামি দেখতে পেতেন। সাধারণের ব্যবহার্য পাইখানা, স্টেশনের ও ধর্মশালার শৌচাগারের দুর্দশা দেখে তাঁর মন খিন্নক্লিষ্ট হত। তিনি দেখতেন গ্রামের গরীবদের ও গরুগাড়ী চলার পথের দুরবস্থা, স্নানপানের পুকুরের জলের রঙ সবুজ, মানুষ ময়লা জলে নিত্য স্নান করে, ঘাটপথ নোংরা করে, কাশীর বিশ্বনাথের পাথরের মেঝেতে ময়লাজমা টাকা পোঁতা, মন্দির প্রবেশের গলি নোংরা ও পিছল, যাত্রীদের কদভ্যাসের দোষে কাগজেখোসায় বিড়ির টুকরোয় থুথুতে রেলের কামরা দুর্বিষহ। মনোদুঃখে বলতেন যে এদেশে এত মানুষ খালি পায়ে পথ চলতে বাধ্য হয় তবু পথঘাটের এ কী রূপ! বম্বের মতো সভ্য শহরেও পথচারীরা গায়ে মাথায় থুতু পানের পিক্ পড়ার ভয়ে তটস্থ শঙ্কিত।

নাগরিক সম্বর্ধনার উত্তরে গান্ধী জনসভায় বলতেন, "তোমাদের চওড়া রাস্তা, ঝলমলে আলোকসজ্জা আর সুশোভন ময়দানের জন্য তোমাদের সাবাস্ জানাচ্ছি। তোমাদের মূল কাজ হচ্ছে সাফাই করা। যে নগরপালিকা সংস্থা দিবারাত্র সকল সময়ে পথ-গলি পরিষ্কার রাখতে পারে না তাদের নিশ্চিহ্ন হওয়াই দরকার। তোমাদের বেতনভুক মেথররা কি অবস্থায় বাস করে তার খোঁজ রাখ কি?"

জনসাধারণকে বলতেন, "ঝাঁটা বালতি হাতে করতে না শিখলে

তোমরা তোমাদের নগর শহর পরিচ্ছন্ন রাখতে পারবে না।" একটা আদর্শ বিদ্যালয় দেখতে গিয়ে শিক্ষকদের বলেছিলেন, "তোমরা পড়ুয়াদের পুঁথিগত বিদ্যা শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে যদি তাদের পাকা রাঁধুনি আর মেথর করতে পার তবেই তোমাদের বিদ্যালয় আদর্শ হয়ে উঠবে।" ছাত্রদের বলেছিলেন, "তোমরা নিজেরা ভাঙ্গী হলে তোমাদের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে পারবে। দক্ষভাঙ্গী হতে ভিক্টোরিয়া ক্রুশলাভের মতো সাহসের দরকার হয়। এই অতি দরকারী কাজটার প্রতি দেশের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মানুষরা অবজ্ঞা দেখিয়ে এর দায়িত্ব নিতান্ত মূর্খ অজ্ঞ লোকের ওপর সঁপে দিয়েছে বলেই ভারতের গ্রাম নগরী নোংরা অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে। যখন আমরা ব্রাহ্মণের পেশার মতো মেথরগিরিকে মূল্য দিতে শিখব, তখন ভারত আবার স্বচ্ছ সুস্থ দেশ হয়ে উঠবে। মানুষের চরিত্র দিয়ে সে অসৎ কি মহৎ তার বিচার হয়—পেশা দিয়ে হয় না।"

কখনও বা সভায় গিয়ে শুধাতেন, ও দিকটা বাঁশের বেড়া দিয়ে আড়াল করা কেন? ওখানে বুঝি অচ্ছুত হাড়িমেথররা বসবে! তবে আমি এ মঞ্চে বসব না, ওদের মাঝে ঠাঁই করে নেব। আমার আসন যে ওদের পাশে।"

তাঁর আশ্রমের আশপাশের গ্রামের মানুষরা মাটি দিয়ে মল চাপা দিতে চাইত না, বলত, "ও তো ভাঙ্গীর কাজ। ও কাজ করলে আমাদের জাত যাবে। মল চোখে দেখা পাপ, তাতে মাটি চাপা দেওয়া ঘোরতর পাপ কাজ।" ব্যক্তিগত উদাহরণ দিয়ে শেখাবার চেষ্টায় গান্ধী কিছুকাল সকালে বেড়াতে যাবার সময় খোন্তা, ঝাঁটা বালতি সঙ্গে নিয়ে, ফেরার সময় পথের মলময়লা তুলে এনে গর্তে পুঁতে দিতেন।

তাঁর আশ্রমে বাসিন্দারা পালা করে মেথরের সকল কাজ করত। গান্ধী ছিলেন তার দলপতি। আশ্রমে কোথাও এতটুকু ময়লা দেখা যেত না। সমস্ত জঞ্জাল, ফলসবজির খোসা পাতকুড়ানো বস্তু ভিন্ন

ভিন্ন গর্তে পোঁতা হত। মলও পুঁতে সার করা হত। কাঁচা নালীর ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও আশ্রমে দুর্গন্ধ বা মাছির উপদ্রব ছিল না। গান্ধী সেখানে বালতি-পাইখানা আর দুটো খোপওলা খাদকাটা পাইখানার পত্তন করেছিলেন। পরদেশী অতিথিদের গান্ধী পরম গৌরবে এই প্রণালী দেখাতেন। আমির-ফকির, দেশী-পরদেশী নেতা ও কর্মী, মানীগুণী সবাইকে এক পাইখানা ব্যবহার করতে হত। ক্রমশ গোঁড়া আশ্রমবাসী এবং মেয়েদের মন থেকে মেথরগিরির প্রতি বিতৃষ্ণা লোপ পায়।

যাহোক কিছু সাফাইয়ের কাজ পেলে গান্ধী খুশী হতেন। পাইখানার পরিচ্ছন্নতার মাপকাঠি দিয়ে তিনি লোকেদের পরিচ্ছন্নতাবোধের রুচি মাপতেন। তিনি ৭৬ বছর বয়সে সগর্বে বলেছিলেন, "আমি যে পাইখানা ব্যবহার করি তা নিদাগ নির্গন্ধ। সেটা অবশ্য আমিই সাফ করি।" তিনি প্রায়ই নিজেকে ভাঙ্গী বলে পরিচয় দিতেন, ভাঙ্গীরূপে দেহান্ত ঘটুক এ কামনা করতেন। বলতেন যে অস্পৃশ্যদের সঙ্গে তাঁকেও যেন গোঁড়াহিন্দুরা একঘরে করে।

তিনি মেথরপল্লীতে যেতেন, তাদের সঙ্গে আলাপ করতেন। তারাও তাঁকে নানা দুঃখের কাহিনী শোনাত। গান্ধী তাদের আশ্বস্ত করে মরাজন্তুর মাংস আর মদ খেতে নিষেধ করতেন। এ কথাও বলতেন যে তাদের একদিনের জন্যও ধর্মঘট করে কাজ বন্ধ রাখা অনুচিত। মেথরদের ধর্মঘট তিনি সমর্থন করতেন না।

"হরিজন" পত্রিকায় আদর্শ ভাঙ্গী সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে, "আমার মতে আদর্শ-ভাঙ্গী কেমন ভাবে ভাল পাইখানা গড়া হবে, কিভাবে ময়লা সাফাই হবে, কোন আরক ওষুধ দিয়ে দুর্গন্ধ নাশ করা হবে, কীটাণু ধ্বংস করা হবে তার নির্দেশ দেবে। মলমূত্র কিভাবে সারে পরিণত করতে হবে তাও সে বাতলাবে। দক্ষ মেথরের সারা ভারতে ডাক পড়বে। মেথরদের দায়িত্ব দিতে হবে, পদমর্যাদা বাড়াতে হবে, তাদের জীবনের মান উচুঁ করতে হবে।" পেটের দায়ে করা বাধ্যতামূলক

ভাড়াটে কাজের বদলে মেথরগিরিকে তিনি অত্যাজ্য সমাজসেবায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন।

বৃদ্ধবয়সে, তাঁর মৃত্যুর দু'বছর আগে, তিনি বম্বে ও দিল্লীর মেথর-মহল্লায় কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। মেথররা যেমন করে যা খেয়ে থাকে তাই তাঁর করার আগ্রহ থাকলেও, ঐ বয়সে এ পরীক্ষা প্রয়োগ সম্ভব হয় নি। তাছাড়া মহাত্মা হবার খেসারত তাঁকে দিতে হত। তিনি মেথরপল্লীতে গেলে তা বিশেষভাবে পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা হত।

বড়লাটের সঙ্গে জরুরী আলোচনা করার জন্য গান্ধী একবার সিমলে পাহাড়ে গিছলেন। ৭৮ বছর বয়সে খাড়া চড়াই ভেঙে ভাঙ্গীবস্তিতে যেতে পারবেন না বুঝে এক সহকর্মীকে তাদের আস্তানা দেখতে পাঠিয়েছিলেন। তারা গোয়ালঘরের অধম কুটিরে বাস করে জেনে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "আমরা ওদের জন্তু করে রেখেছি। তারা মনুষ্যত্ব বিকিয়ে দুচারটে তামার পয়সা রোজগার করে। তারা কিভাবে পাইখানার দেওয়াল ঘেঁষে, আধা-আঁধারে জড়সড় হয়ে উচ্ছিষ্ট খায় তা দেখে আমার বুক ফেটে যায়।" তারা যেভাবে মাথায় ময়লার ঝুড়ি নিয়ে যায় তা দেখেও গান্ধীর মন কুঁকড়ে যেত। যোগ্য সাধন পেলে নিজে নোংরা না মেখে এ কাজ কত পরিপাটিভাবে করা যায় তা বুঝিয়ে দিতেন।

এক সাহেব সাংবাদিক একবার গান্ধীকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনাকে যদি একদিনের জন্য ভারতের বড়লাট করা হয় তো আপনি কি করবেন?"

গান্ধী বলেন, "লাটসাহেবের বাড়ীর কাছে যে সব নোংরা বস্তি আছে তা সাফ করব।"

"যদি লাটগিরির মেয়াদ আর একদিন বেড়ে যায় তবে?"

"সেদিনও ঐ কাজই করব।"

মহাত্মা মুচি

গান্ধী ৬৩ বছর বয়সে বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে য়েরোড়া জেলে বন্দী ছিলেন। বল্লভভাই বললেন, "এ বছর জেলে ভাল মুচি নেই। আমার একজোড়া মনোমত চটি দরকার।" গান্ধী বললেন, "যদি ভাল অহিংসক চামড়া জোগাড় হয় তো আমি চটি বানিয়ে দিতে পারি। দেখি আমার পুরানো বিদ্যে স্মরণ আছে কি না। একদা আমি বেশ ওস্তাদ মুচি ছিলাম হে। আমার তৈরী একজোড়া চটি সোদপুরের খাদিপ্রতিষ্ঠানের সংগ্রহালয়ে আছে। '—' কে চটি জোড়া উপহার দিয়েছিলুম। তিনি জানালেন 'এ কি আমি পায়ে দিতে পারি? এ যে আমার মাথার মুকুট হবার যোগ্য।' টলস্টয় বাড়ীতে আমি অনেক জুতো তৈরি করেছিলুম।

দক্ষিণ আফ্রিকার আশ্রমে প্রিয় জার্মান বন্ধু কলেনবাকের কাছে গান্ধী মুচির কাজ শিখেছিলেন। তিনি আশ্রমের ছাত্রদের একাজে তালিম দিয়েছিলেন। তারা এত ভাল জুতো বানাত যে সেগুলো বাজারে বিক্রি হত। সে যুগে গান্ধীই প্রথম চটির মতো ফাঁকওলা অথচ বকলেস-আঁটা জুতো পোশাকের সঙ্গে ব্যবহার করতেন। গরম দেশে ঢাকা জুতোর চেয়ে স্যাণ্ডাল বেশী আরামদায়ক ছিল আবার শীতে তা মোজার সঙ্গে পরা চলত।

গান্ধীর কাছে দরকারী কাজ মেটাবার জন্য একবার জওহরলাল, প্যাটেল প্রমুখ নেতারা ওয়ার্ধায় গিয়ে দেখেন মহাত্মা আশ্রমের একদল

শিক্ষার্থীদের মহা উৎসাহে জুতো সেলাই শেখাচ্ছেন; বলছেন, "এ চামড়ার টুকরোটা এখানে বসাতে হবে। সুকতলার ঐ জায়গায় বেশী চাপ পড়ে তাই ওখানে ডবল পট্টি বসাতে হবে। সেলাইয়ের ফোঁড়গুলো এইভাবে দিতে হবে।" ছাত্ররা তাঁকে দেখিয়ে ভুলচুক শুধরে নিচ্ছিল। একজন কর্তাব্যক্তি অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, "ওরা যে আমাদের সময়ে ভাগ বসাচ্ছে।" গান্ধী মৃদু হেসে জবাব দিলেন, "আহা, ওদের কাজে বাগড়া দিও না। ইচ্ছা হলে তোমরাও কেমন করে ভাল চটি তৈরি করতে হয় তা শিখতে পার।"

আর একবার দেখা গেল সাথীদের নিয়ে গান্ধী সেবাগ্রামে বসে আছেন আর হাতেকলমে শিক্ষা দেবার জন্যে তাঁদের সামনে চামাররা মরা ষাঁড়ের ছাল ছাড়াচ্ছে। গান্ধী দেখলেন চামাররা অদ্ভুত কৌশলে গেঁয়ো ছুরি চালিয়ে ছাল ছাড়িয়ে নিল, চামড়া একটুও জখম হল না। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন যে পাকা ডাক্তারও বিলিতি ছুরি দিয়ে চামারদের চেয়ে নিপুণভাবে এ কাজ করতে পারে না। গান্ধীর মতে ডাক্তারীশাস্ত্রের প্রতিছাত্রই চামার কারণ সে মরা মানুষের দেহচ্ছেদ করে। ডাক্তার মড়া কাটে, দেহ চিরে পরীক্ষা করে। তাকে আমরা মানী মানুষ মনে করে মর্যাদা দিই আর জন্তুর দেহ কেটে যারা ছাল ছাড়ায় তাদের অচ্ছুত চামার বলে ঘেন্না করি।

কেবলমাত্র মুচির কাজ শিখে গান্ধীর দায় মিটল না। জগৎজুড়ে কত মানুষ জুতো পরে, সেজন্য অনেক চামড়া লাগে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সুস্থ জীবন্ত গরু-ছাগল-ভেড়া মেরে চামড়া জোগাড় করা হয়। গান্ধী ছিলেন অহিংসাবাদী। নিজের সুখের জন্য কোনও প্রাণী হত্যা করা পাপ মনে করতেন। যে মানুষ রুগ্ন স্ত্রী বা পুত্রের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে মাংসের সুরুয়া বা ডিম ব্যবহার করেননি, তিনি চকচকে জুতো পরার জন্যে জীবহত্যা মঞ্জুর করেন কেমন করে! অথচ চামড়া চাই।

গান্ধী ঠিক করলেন কেবলমাত্র বুড়ো হয়ে বা অসুখ হয়ে সহজে মরে-যাওয়া জন্তুর চামড়া দিয়ে কাজ সারবেন। এভাবে তৈরী জুতোর নাম হল অহিংসক চপ্পল। সহজে মরে-যাওয়া জন্তুর চামড়ার চেয়ে হত্যাকরা জন্তুর চামড়া সাফশোধন করা সহজতর তাই দোকানীরা অহিংসক চামড়া রাখত না। অহিংসক চামড়ার জন্য গান্ধীর চামারের বিদ্যে জানাও দরকার হয়ে পড়ল। কোনও একটা বিষয় গান্ধীর মাথায় ঢুকলে সে সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ জেনে তবে তাঁর স্বস্তি হত।

গান্ধী হিসেব কষে জেনেছিলেন যে আমাদের দেশ থেকে বছরে নয় কোটি টাকার কাঁচা চামড়া বিদেশে চালান যায় আর সে চামড়া পাকা করে কোটি কোটি টাকার তৈরী জিনিস ভারতে আমদানি হয়। তার ফলে শুধু যে আমাদের টাকা বিদেশে চলে যায় তা নয়, আমাদের মাথা খাটিয়ে কাজ করার শক্তিও নষ্ট হয়ে যায়। সব বিষয়ে আমরা পরদেশী জিনিসের প্রত্যাশী হতে শিখি, নিজেদের কিছু গড়ে তোলার শক্তি থাকে না। দৈনিক ব্যবহারের কত চামড়ার জিনিস গড়ার কৌশল আমরা ভুলে গেছি। তাঁর মতে, "পুরাকালে এ ছুঁয়াছুঁত বিধি ছিল না। কবে থেকে যে চামারের কাজ ঘৃণ্য বলে গণ্য হয়েছে জানি না। যেদিন থেকে কারিগরি কাজকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ঘৃণা করা আরম্ভ হয়েছে, বুদ্ধির কাজ ও গতরের কাজকে ভিন্নভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, সেদিন থেকে এ দুর্ভাগা দেশে সর্বনাশ ডেকে আনা হয়েছে। এই অতি দরকারী কাজে প্রায় লাখখানেক চামার রত থাকে, তাদের আমরা বংশ পরম্পরায় অচ্ছুত করে রেখেছি।"

ভদ্রশিক্ষিত লোকেরা এভাবে তাদের ঘৃণ্য অচ্ছুত করে রেখেছে বলেই তাদের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধন সব কিছুর এমন অভাব ঘটেছে। জাতের ছোঁয়াছুঁয়ি মানার কু-অভ্যাস থেকেই আমাদের দেশে একদল মানুষের দুর্গতি ঘটেছে। অথচ মেথর, মুচি, চামাররা সমাজের সেবা করে, খুব দরকারী কাজ করে। অন্য দেশে মানুষ মুচি বা চামার

হলেই বোকা মূর্খ অচ্ছুত হয় না। গান্ধী দেশের বিদ্বান ও বিজ্ঞানীদের চামারের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্যে কাঁচা চামড়া ভালভাবে আরক ওষুধ দিয়ে শোধন করে পাকা করার সাহায্য করায় ডাক দিয়ে কাগজে লিখলেন: "চামারের কাজ উন্নত করার জন্যে আমি রসায়ন শাস্ত্রের পণ্ডিতদের সাহায্য চাই। এদেশে চামড়া শোধন করার বিদ্যে ক্রমশঃ লোপ পেয়ে যাচ্ছে, আমরা আর ভাল চামড়া করায় পটু নই। এ কাজে আপনারা পরামর্শ দিন, সাহায্য করুন। মরা জন্তুর ছাল ছাড়িয়ে দেহটা কোথায় কিভাবে চালান করতে হবে তার বুদ্ধি দিন, তাহলে চামাররা মরা গরুর মাংস খাওয়ার কদভ্যাস ত্যাগ করতে শিখবে।"

চামারদের বাড়ীতে মরা গরু ষাঁড় এলে মহা উৎসব শুরু হয়। সেদিন মাংসের ভোজ হবে। ছোট ছেলেরা জন্তুটাকে ঘিরে নাচতে থাকে। ছাল ছাড়াবার পর মাংসের টুকরো বা হাড়ের খণ্ড নিয়ে লোফালুফি করে। বৈষ্ণববংশের সন্তান গান্ধী এভাবে হাড়মাস নিয়ে নাচানাচি মাতামাতির দৃশ্য সইতে পারতেন না।

তিনি চামারদের বলেছিলেন, "তোমরা ভাগাড়ের মরা গরুর মাংস আর মদ খাওয়া ছাড়বে না কি? ওসব খেলে আমি যদি বা তোমাদের সঙ্গে মিশতে রাজী হই, গোঁড়া হিন্দুরা তোমাদের ছোঁবে না।" তারা বলল, "আমরা নোংরা কাজ করব, মরা জন্তুর ছাল ছাড়াব আর তার মাংস খাব না, মদ খাব না—এ কেমন করে হয়?" গান্ধী উত্তর দিলেন, "চামারের কাজ করলেই মরা জন্তুর মাংস খেতে হবে এমন কথা নেই। আমিও একদিন চামারের ব্যবসা করতে পারি, তা বলে আমি মোটেই মদ মাংস খাব না। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে মেথর ও চামারের কাজ খুব পরিচ্ছন্নভাবে আর স্বাস্থ্যকর উপায়ে করা যায়।"

গান্ধী চামারের ব্যবসা করেননি কিন্তু আশ্রমে মুচিখানা ও চামারখানা খুলেছিলেন। সেখানে অহিংসক চামড়া দিয়ে চপ্পল জুতো, ব্যাগ

প্রভৃতি হাতে তৈরী হত। প্রথমে ছোটমাপে কাজ আরম্ভ হয়েছিল, পরে চাঁদার টাকায় ৫০,০০০ টাকা খরচ করে পাকা বাড়ীতে বড় মাপে হাতে-করা চামড়ার কাজের কারখানা গড়ে ওঠে। বাজারে সে সব মাল বিক্রি হত।

স্বদেশী যুগে বাঙলাদেশে এসে গান্ধী স্বদেশী চর্মালয় খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে গিছলেন। কিভাবে নুনমাখান ছাল চুণে ধুয়ে লোম খসান হয়, রঙ করা হয়, ক্রোমচামড়া করা হয় সব জেনে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে চামড়া নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল তার খবরও তাঁর অজানা ছিল না। গান্ধী পুরানো ঢঙের শোধন প্রণালী একেবারে বাতিল করার পক্ষপাতী ছিলেন না। শত শত বছর যে বিদ্যে কাজ দিয়েছে তার অদলবদল ঘটিয়ে উন্নতি করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। গ্রাম থেকে চর্মালয় শহরে নিয়ে যেতেও চাইতেন না। পাঁচ লাখ গ্রামের শিল্প ও কারিগরি বিদ্যা শহরে সরিয়ে নিয়ে গেলে গ্রামবাসীরা অনশনে মরবে, তাছাড়া তাদের যেটুকু মগজ খাটাবার ও কুশলভাবে হাত চালাবার ক্ষমতা আছে তা লোপ পেয়ে যাবে। তারা গরুবলদের সঙ্গে থেকে জন্তু হয়ে যাবে।

গ্রামে মরা গরু সরাবার পদ্ধতির সুব্যবস্থা করায় তিনি উৎসুক ছিলেন। চামাররা মরা জন্তু টেনে হিঁচড়ে বাড়ী নিয়ে যায়। ঘষা লেগে চামড়া দাগী হয়ে যায়, ছিঁড়ে যায়। হাড়গুলো তারা কুকুরকে খেতে দেয়। ঐ হাড় দিয়ে বিদেশীরা কত জিনিসের হাতল গড়ে, বোতাম করে। হাড়ের গুঁড়ো দিয়ে খুব ভাল সার হয় একথাও তারা জানে না।

গান্ধী চামারমুচিদের সঙ্গে মিশতেন, তাদের সঙ্গে আলাপ করতেন, তারা কিভাবে কত কষ্টে দিন কাটায়, নোংরা বস্তিতে থাকে, কি খায় সব লক্ষ্য করতেন। তারাও তাঁকে দুঃখীর বন্ধু বলে জানত, তিনি মুচিপাড়ায় গেলেই তাদের সুখদুঃখের কাহিনী শোনাত। তাদের যে সবাই ঘৃণা করে, ছোঁয় না, সবচেয়ে নোংরা বস্তিতে থাকতে দেয়, কুয়ো

থেকে জল তুলতে দেয় না—এই সব নালিশ জানাত। গান্ধীর মন করুণায়-লজ্জায় ভরে উঠত। কিন্তু তিনি শুধু দয়া করে অভাগাকে দু-দশ টাকা ভিক্ষা দিয়ে তুষ্ট হতেন না। "হে মোর দুর্ভাগা দেশ, মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান"—এই সাবধান বাণীতে বিশ্বাস করতেন।

তিনি বুঝলেন যে দেশে এমন একদল নিঃস্বার্থ কর্মী চাই যারা অচ্ছুতদের জীবনে আলো জ্বেলে দেবে। তারা যাতে ন্যায্য মজুরি পায়, ভাল ঘরে থাকতে পায়, খেতে প'রতে পায়, রোগে চিকিৎসা করাতে পারে, শিক্ষা পায়, আত্মসম্মান ফিরে পায় কর্মীরা সেদিকে নজর দেবে। হরিজনদের সহায়তা করার জন্যে গান্ধী কর্মীদল গড়লেন, তাঁর "হরিজন" সাপ্তাহিকে লিখে লিখে জনমত গঠন করতে থাকলেন। তিনি মুচিপাড়ায় রাত-পাঠশালাও খুলেছিলেন। হরিজনরা যাতে নিজের জোরে হেঁট মাথা উঁচু করে চলতে শেখে এই তাঁর লক্ষ্য ছিল।

চামাররাও গান্ধীর ডাকে সাড়া দিতে চেষ্টা করত। তাঁকে তুষ্ট করার জন্যে কখনও বা বলত শুধু অহিংসক চামড়া দিয়ে ব্যবসা চালাবে, কখনও বা বলত মদ ও মরাজন্তুর মাংস খাওয়া ছেড়ে দেবে। একবার ভারতভ্রমণ কালে গান্ধীর চটি জীর্ণ হয়ে গিছল, সঙ্গে আর বাড়তি অহিংসক চপ্পল ছিল না। তিনি ছেঁড়া চটি পায়ে দিয়ে মুচিদের সভায় গিয়েছেন দেখে দুই মুচিতে মিলে একজোড়া অহিংসক চপ্পল তৈরী করে তাঁকে ভেট দিল।

এতো গেল গান্ধীর জুতো লাভের কথা; তাঁর জুতোদানের গল্পও আছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় স্মাট্স নামে এক গোরা শাসন-কর্তার সঙ্গে তাঁর বেজায় ঝগড়া বেধেছিল। সাহেব কিছুতে কালাআদমী ভারতীয়দের কোনও সুবিধে অধিকার দেবে না, গান্ধীও নাছোড়বান্দা—দশবছর ধরে তর্কবিবাদ চলেছিল। সাহেব উত্যক্ত হয়ে গান্ধীকে কয়েদ করেন। সাহেবের হাতে-তৈরী মজবুত চপ্পল

পরার সখ হয়েছে শোনামাত্র গান্ধী তাঁকে একজোড়া আশ্রমিক চটি উপহার পাঠিয়েছিলেন। গান্ধী পরে মহাত্মা হয়ে গিয়েছেন, বিদেশে তাঁর নামে তাঁর দেশ ধন্য। তাঁর ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে উৎসবকালে স্মাট্‌স অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন, "আমি যার জুতোর ফিতে খোলার যোগ্য নই এমন মহামানব গান্ধী আমাকে হাতে-তৈরী একজোড়া চটি উপহার দিয়েছিলেন। আমি বহুবছর সেটা ব্যবহার করেছি।"

সেবাপরায়ণ ভৃত্য

আশ্রমজীবনে গান্ধী চাকরদাসীর সকল কাজই করেছিলেন। তার আগে যখন ব্যারিস্টার, গান্ধী মাসে চার হাজার টাকা আয় করতেন তখন রোজ ভোরে যাঁতায় আধঘণ্টা গম পিষতেন। তাঁর ছোট ছোট ছেলেরা এবং কস্তুরবা তাঁকে এ কাজে সাহায্য করতেন। তার ফলে তাঁরা পছন্দমত তাজা মোটা বা মিহি আটা খেতে পেতেন। সবরমতী আশ্রমেও গান্ধী গম পেষাই করতেন। যাঁতা মেরামতের কাজেও তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় দিতেন। একদা আশ্রমে আটা বাড়ন্ত এ নালিশ শোনামাত্র তিনি সঙ্গীদের নিয়ে গম ভাঙতে লেগে গিছলেন। পেষাই করার আগে তিনি ভালভাবে গম বেছে নিতেন। এই নামী মানুষটির সঙ্গে দেখা করতে এসে অনেকে দেখত তিনি একটা খাটো খাদি থান পরে খালি গায়ে গম বা চালডাল বাছচেন। বাইরের মানুষের সামনে এ জাতীয় কাজ করায় তাঁর একটুও লজ্জাসঙ্কোচ বোধ হত না। কলেজের একটি পড়ুয়া তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সে খুব ভাল ইংরেজী বলতে লিখতে পারত বলে তার মনে একটু অহঙ্কার ছিল। যাবার সময় সে বলল: "বাপু, যদি আপনার কোনও কাজে লাগতে পারি তো দয়া করে বলবেন, আমি খুশীমনে সে কাজ করব।" তার মনে আশা ছিল লেখাপড়ার কিছু কাজ মিলবে। গান্ধী বললেন, "ভাল কথা, এখনই যদি সময় থাকে এই গমগুলো বেছে দাও।" সে বেচারা ফাঁপরে পড়ল, ঘণ্টাখানেক গম বাছার পর ক্লান্ত হয়ে বিদায় নিল।

গান্ধী কিছুকাল আশ্রমের ভাঁড়ারীর কাজও করেছিলেন। কেবলমাত্র ভাঁড়ারে রসদ জমা করে বা তা বিলি করে, তরিতরকারি বাছাইগোছাই করে রেখেই তিনি তৃপ্ত হতেন না। খাবারের গুণাগুণ সম্বন্ধে তাঁর পাকা জ্ঞান ছিল। এক রুগীকে কালো দাগপড়া পাকা কলা খেতে দেওয়ায় সে খুব বিরক্ত হয়েছিল, ভেবেছিল তাকে তাচ্ছিল্য করে অমন কলা খেতে দেওয়া হয়েছিল। তার পেটের পক্ষে অমন কলা উপকারী বুঝে গান্ধী খেতে দিয়েছিলেন জেনে সে লজ্জা পেয়েছিল। রান্নাঘরে বা ভাঁড়ারের কোণে একটু ঝুলময়লা বা মাকড়সার জাল নজরে পড়লে তিনি সহকর্মীদের বকুনি দিতেন।

আশ্রমে ভোরে প্রার্থনার পর গান্ধী কুটনো কুটতেন। এক সহকারী আ-ধোয়া আলু কেটে জলে ধুচ্ছে দেখে তিনি লেবু, টম্যাটো ও আলু কাটার আগে খোসাশুদ্ধ অবস্থায় ঘষে ঘষে ধুয়ে নেওয়া উচিত তা বুঝিয়ে দেন।

সুস্থচিত্তে বাড়তি কাজ করার পটুতা তাঁর ছিল। তিনি কাজ ভালবাসতেন, সারাদিন বহুবিধ কাজ করতেন, কখনও সময় নষ্ট করতেন না অথচ ব্যস্তভাবে কাজ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। যখন আশ্রম বাঁধা হচ্ছিল তখন দু'দশজন অতিথিকে তাঁবুতে শুতে হত। এক নবাগত অতিথি ভোরে উঠে নিজের বিছানা গুটিয়ে কোথায় তা রাখতে হবে খোঁজ করতে গিছল। ফিরে দেখে গান্ধী বিছানাটি মাথায় বয়ে যথাস্থানে রাখতে চলেছেন। খাবার পর আপন আপন বাসন ধোয়া আশ্রমের বিধি ছিল। রান্নার বাসন পালাক্রমে মাজা হত। একদিন গান্ধী রান্নার বড় বড় ভারী বাসন মাজার ভার নিয়ে একহাত ছাই মেখে একটা ডেকচি ঘষতে লেগে গিছলেন। সহসা কস্তুরবা সেখানে এসে গান্ধীর হাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে বললেন, "এ তোমার কাজ নয়, এ কাজ করার বহু মানুষ আছে।" গান্ধী তাঁর ওপর এ কাজের ভার দেওয়া নিরাপদ বুঝে সরে যান। জেলসঙ্গীর চাটুমাজা দেখে অখুশী হয়ে তিনি বলেছিলেন যে তিনি একদা রূপোর মতো ঝকঝকে করে লোহার বাসন মাজতে পারতেন।

রাস্তার ওপারের কুয়ো থেকে আশ্রমের জল আসত। অন্যদের সঙ্গে গান্ধীও রোজ জল তুলতেন। একদিন তাঁর শরীর খারাপ ছিল তাছাড়া যাঁতা চালিয়ে তিনি ক্লান্ত ছিলেন দেখে তাঁর শ্রমলাঘব করার জন্য এক আশ্রমবাসী চুপিচুপি ছেলেবুড়োর সাহায্যে ছোট বড় সব পাত্রে জল ভরে রেখেছিল। পরে জল ভরতে এসে, ব্যাপার বুঝে গান্ধী খুঁজে খুঁজে বাচ্চাদের স্নানের একটা টব্ তুলে নিয়ে জল ভরে আনেন। তাঁর কাণ্ড দেখে সঙ্গীটির আপসোসের সীমা রইল না। অন্যদের চেয়ে তাঁর বয়স বেশী বা নামডাক বেশী বলে গান্ধী আশ্রমের বাঁধা কাজ থেকে ছুটি নিতেন না। শরীর অপটু না হওয়া পর্যন্ত নিয়মমত খেটে যেতেন। সকল কাজ করার জন্য তাঁর অফুরান কর্মক্ষমতা ও অসীম মনোবল ছিল। ক্লান্তি কি তা তিনি জানতেন না। কখনও কখনও দিনেরাতে মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমোতেন, বাকী ২১ ঘণ্টা পরিশ্রমের ও মাথার কাজ করতেন। টলস্টয়বাড়ী বড় রেলস্টেশন ও শহর থেকে ২১ মাইল দূরে ছিল। দরকারী সওদা আনার জন্য গান্ধী একদিনে ৪২ মাইল পথ চলতেন। রাত দুটোয় উঠে, ঘরে-তৈরী খাবার সঙ্গে নিয়ে, তিনি রওনা হতেন, ফিরতেন সন্ধ্যায়। তাঁর দেখাদেখি অন্যরাও খুশীমনে এ কাজ করত। বুয়োর যুদ্ধের সময় ডুলিতে রুগী নিয়ে গান্ধী দিনের পর দিন ২৫ মাইল পথ চলতেন।

তাঁর অনুচররা একবার একটা মজাপুকুর ভরাট করছিল। এক সকালে কাজ শেষে ঝুড়ি কোদাল নিয়ে ফিরে তারা দেখে তাদের ফলটল কেটে কে আলাদা আলাদা রেকাবিতে সাজিয়ে রেখেছে। খোঁজ নিয়ে জানল এ তাদের বাপুজীর কাজ। একজন কুণ্ঠিতস্বরে শুধাল, "আপনি আমাদের জন্য কেন কষ্ট করলেন? আমরা কি আপনার সেবাগ্রহণের যোগ্য?" গান্ধী হেসে জবাব দিলেন, "নিশ্চয়, তোমরা অত শ্রম করে ক্লান্ত হয়ে ফিরবে জানতুম। হাতে সময় ছিল তাই এ কাজটা সেরে রেখেছি।"

একটি ভারতীয় ছাত্রের বিলেতে ভারী অদ্ভুতভাবে গান্ধীর সঙ্গে

পরিচয় ঘটে। দক্ষিণ আফ্রিকার কর্মবীর গান্ধী বিলেতের মন্ত্রীদের কাছে ভারতীয়দের দাবি জানিয়ে দরবার করতে গিছলেন। ভারতীয় ছাত্ররা তাঁকে সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করে। ছাত্ররা নিজেরা নিরামিষ খানা রেঁধে পরিবেশন করবে ঠিক হয়। বেলা দুটো নাগাদ এক পাতলা গড়নের মজবুত মানুষ মহা উৎসাহে রেকাব গেলাস ধুতে, তরকারি কাটতে থাকে। খানিক বাদে ছাত্রদের দলপতি এসে আবিষ্কার করল যে, সে অজানা মানুষটি তাদের সান্ধ্যবৈঠকের ভাবী সভাপতি গান্ধী!

গান্ধী কাজে খুঁত সইতে পারতেন না কিন্তু অন্যদের নিজ সেবায় লাগাতে ভালবাসতেন না। দেশসেবকদের সভাশেষে, সারাদিন দীর্ঘ আলোচনার পর, একজন কর্মী রাত দশটার সময় গান্ধীর কুটিরে গিয়ে দেখে তিনি ঘর ঝাঁট দিয়ে বিছানা করার আয়োজন করছেন। সে কুণ্ঠিতবোধ করছে দেখে মৃদুহেসে গান্ধী তাকে বাকী কাজ সারতে দেন। অজানা গাঁয়ে সফর করার সময় ভোর রাতে হারিকেনের তেল ফুরিয়ে গেলে গান্ধী চাঁদের আলোয় চিঠিপত্তর লিখে নিতেন, হাঁকডাক করে আলো জ্বালিয়ে দিতে বলতেন না। নোয়াখালিতে পাদপরিক্রমার সময় গান্ধী সঙ্গে মাত্র দু'জন সঙ্গী রেখেছিলেন। তারা তাঁর আশ্রমবাসী ছিল না ফলে কিভাবে খাকরা করতে হয় জানত না। গান্ধী রান্নাশালে ঢুকে অভ্যস্থ কর্মীর মতো উবু হয়ে বসে কিভাবে খাকরা বেলতে সেঁকতে হয় দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৭৮ বছর।

শিশুদের সঙ্গ গান্ধী খুব পছন্দ করতেন। নিজের ছেলেদের শুধু পড়াতেন না, দু'তিনমাস বয়স হবার পরই তাদের সামলাবার ভার নিতেন। ঝি চাকরের হেপাজতে রাখতেন না। মা বাপের সঙ্গ এবং যত্ন শিশুর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় বোধ করতেন। খাওয়ান, ঘুম পাড়ান এবং সেবা করার ব্যাপারে তিনি মায়ের মতো পটু ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় একবার জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গান্ধী বাড়ী এসে দেখেন তাঁর শ্বেতাঙ্গিনী বন্ধুপত্নী আট মাসের ছেলেকে সামলাতে কাহিল হয়ে পড়েছেন। তাকে মায়ের দুধ পান করার অভ্যাস

ছাড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছিল। পরিত্রাহি চিৎকার করে সে মাকে রাতে শুতে ঘুমোতে দিচ্ছিল না। গান্ধী সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ভার নিলেন। সারাদিন খেটে সভায় বক্তৃতা দিয়ে, প্রতি রাতে চার মাইল হেঁটে বাড়ী এসে তিনি শিশুটিকে মায়ের পাশ থেকে তুলে এনে কাছে নিয়ে শুতেন। রাত একটায় ফিরলেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটত না। তেষ্টা মেটাবার জন্য মাথার কাছে একটা জলপাত্র রেখে দিতেন। শিশুটি জলটল কিছুই চাইত না, চুপচাপ ঘুমাত। গান্ধীর যাদুতে এক পক্ষকাল পরে সে মায়ের দুধ খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করে।

বয়স্থ মান্য লোকদের সেবা করায় গান্ধী দক্ষ ছিলেন। সুদূর প্রবাস থেকে এসে তিনি কলিকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে স্বেচ্ছায় তিনি একাধারে মেথরের, বেহারার ও কেরানীর কাজ করতে লেগে গিছলেন। একজন মুরুব্বীকে জিগেস করেছিলেন, "আমি আপনার কোন্ কাজে লাগতে পারি?" তিনি বললেন, "অনেক চিঠিপত্তর জমে গেছে। বিশ্বাসী কোনও কেরানী নেই, যার হাতে এ কাজ সঁপে দিতে পারি। আপনি কি এ কাজ করবেন?" "নিশ্চয় করব। আমার শক্তিতে কুলোয় এমন যে কোনও কাজই করতে আমি সর্বদা প্রস্তুত" বলে অতি অল্পকালে গান্ধী সব কাজ সেরে ফেলেন। ভদ্রলোক তো তাজ্জব; বললেন, "এর নাম প্রকৃত সেবা-মনোভাব। আজকালকার ছেলেরা একথা বুঝতে চায় না।" তিনি ছিলেন পুরানো আমলের বাবুমানুষ, বেয়ারা ছাড়া চলতে পারতেন না। গান্ধী খুশীমনে তাঁর জামায় বোতাম এঁটে দিতেন, অন্য ফরমাসও খাটতেন। প্রকৃত সেবকের কখনও মনিবের প্রতি রাগ দেখান উচিত নয়—এ মতে গান্ধী বিশ্বাস করতেন। অবশ্য তাঁর মনিবভৃত্যের ব্যাখ্যা ছিল ভিন্ন। তিনি লাটসাহেব, প্রধানমন্ত্রীদের দেশবাসীর চাপরাসী ও সেবকভৃত্য বলে গণ্য করতেন। গোখলে যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় গিছলেন তখন গান্ধী তাঁর গলাবন্ধ ইস্ত্রি করে দেওয়া, বিছানা করা, খাবার বয়ে আনা এসব করেছিলেন, এমন কি

তাঁর পা টিপে দিতেও উৎসুক ছিলেন। গোখলের প্রবল ওজর আপত্তিতে কান দেননি।

আশ্রমে যখনই কোনও অভিজ্ঞ কুশলী ভৃত্যের সাহায্যের দরকার হত তখন গান্ধী ছোঁয়াছুঁয়ি মানার কাভ্যাস দূর করার জন্য অস্পৃশ্যদের কাজে লাগাতেন। তিনি বলতেন, "আমি কখনও কাউকে আমার চাকর বলে গণ্য করিনি। আমরা চাকরদের বেতনভুক মজুর না মনে করে যেন আপন ভাই বলে ভাবতে শিখি। এর ফলে কিছু গোলযোগ ঘটবেই, কিছু চুরি হবে, কিছু খরচ বাড়বে, তবু এ চেষ্টা ব্যর্থ হবে না।"

স্বাধীন সবল গান্ধী ভৃত্যের সেবা নিতেন না কিন্তু জেলে সরকার একদা তাঁর সেবায় অনেক কয়েদীকে নিয়োগ করেছিল। একজন ফল কেটে দিত, এক মারাঠাকয়েদী ছাগলীর দুধ দুইত, আর একজন ফাইফরমাস খাটার জন্য হাজির থাকত। এক ব্রাহ্মণ বাসন মাজত, মেথর নিজকাজ করত আর দুজন সাহেব বন্দী রোজ তাঁর খাটিয়া ঘরে বাইরে নিত।

ইংলণ্ডে মনিবভৃত্যের মধ্যে আত্মীয়ভাব দেখে গান্ধী বড় খুশী হয়েছিলেন। আদর আপ্যায়নমাখা আতিথ্যশেষে ধনী গৃহস্বামী তার চাকরদের সঙ্গে গান্ধীর পরিচয় করিয়ে দিত। এভাবে মনিবরা চাকরদের হীনজন মনে না করে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত আত্মীয় বলে মেনে নেয় দেখে গান্ধীর মন আনন্দে ভরে যেত। এক ভারতীয় গৃহস্বামীর বাড়ী চারমাস আতিথ্যভোগ করার পর বিদায় নেবার সময় চাকরদের লক্ষ্য করে গান্ধী বলেছিলেন, "তোমাদের কাছে যে আমি কত ঋণী ও কৃতজ্ঞ তা বলে বোঝাতে পারব না। তোমরা আমার ভাইবোনের সামিল। তোমাদের এ সেবার পুরস্কার দেবার শক্তি আমার নেই কিন্তু ভগবান তোমাদের অশেষ কল্যাণ করবেন।"

:

বেরসিক রসুইয়া

গান্ধীর প্রিয় সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই একবার প্রশ্ন করেছিলেন, "বাপুজী, ফিনিক্সবসতিতে যাবার আগে পর্যন্ত আপনার বাসায় পাচক ছিল তো?" গান্ধী জবাবে বলেছিলেন, "না, তার আগেই ও পাট চুকিয়ে দিয়েছিলুম। একটি ভাল রাঁধনী বামুন ছিল, সে বললে মশলাছাড়া রান্না সে করতে পারবে না। আমি তখনই তাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছিলুম। সেই থেকে আর ঠাকুর রাখিনি।" গান্ধীর যখন ৩৫ বছর বয়স তখন এ ব্যবস্থা হয়েছিল।

সখ করে নিজহাতে রান্না করা গান্ধী শুরু করেন ১৮ বছর বয়সে। বিলেতে ছাত্রাবস্থায় নিরামিষ খেতেন বলে ভারী অসুবিধা হত। ওদেশে অধিকাংশ লোক আমিষ খায়, আমাদের মতো থোড়-মোচা-শাক-চচ্চড়ি রান্নার চল্ নেই সেখানে। নিরামিষ হোটেলে খেয়ে গান্ধীর পেট ভ'রত না। তিনি লণ্ডনের প্রায় প্রত্যেকটি নিরামিষ ভোজনালয়ে খেয়েও তৃপ্তি পাননি। বাড়ীওয়ালীর রান্নাও ছিল একই ধাঁচের। মায়ের হাতের স্বাদু মশালাদার রান্না খাওয়ায় অভ্যস্থ গান্ধীর মুখে নুনমশলা ছাড়া জলেসেদ্ধ শাকসবজি রুচত না, রুটি মাখন মোরব্বা একঘেয়ে লাগত। অথচ খাওয়ার খরচ কিছু কম পড়ত না। এভাবে কয়মাস খাবার পর গান্ধী কম খরচে চলবার সিদ্ধান্ত নেন। একটা ঘর ভাড়া নিয়ে, স্টোভ এনে, নিজেই প্রাতরাশ ও সান্ধ্যভোজ রাঁধতে লেগে যান। এভাবে রাঁধতে তাঁর বিশ মিনিট সময় লাগত

আর দৈনিক খরচা হত মাত্র আনা বারো। মধ্যাহ্ন ভোজন সারতেন হোটেলে কমদামী খাবার খেয়ে। "লণ্ডন নিরামিষ সমিতি"র সঙ্গে পরিচিত হবার পর এবং সল্ট সাহেবের "নিরামিষ আহারের ওকালতনামা" নামে বইখানা পড়ে তিনি খাওয়ার ঢঙের হেরফের ঘটিয়েছিলেন।

ব্যারিস্টার হয়ে ভারতে ফেরার পর গান্ধী ছ'মাস বাসাভাড়া করে বম্বেতে ছিলেন, এক প্যাচকও রেখেছিলেন। গান্ধী তাকে দু'চারটে বিলিতি রান্না শিখিয়েছিলেন। এলোবিলি নোংরামি তাঁর সইত না তাই পাচককে ময়লা কাপড় কাচতে, সাফাই করতে আর নিত্যস্নান করতে শেখানো তাঁর এক বাড়তি কাজ হয়ে পড়েছিল।

তাঁর কোনও আশ্রমে কখনও বেতনভোগী পাচক রাখা হয়নি। পাঁচজনের ফরমাশী রান্না করতে গেলে অনেক সময় ও শক্তি নষ্ট হয় এ তাঁর নজর এড়ায় নি। নানালোককে তুষ্ট করার চেষ্টা না করে তিনি একটা রান্নাঘরে সকলের জন্য ঢালাই রান্নার ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান আশ্রমবাসীদের জন্য, ভিন্নজাতের বা ভিন্নধর্মের মানুষদের জন্য আলাদা রান্নাঘর ছিল না। জাস্টসাহেবের "প্রকৃতির পুনরনুশীলন" বইটি পড়ে গান্ধী জেনেছিলেন যে মানুষের খাওয়ার জন্য বাঁচার বদলে বাঁচার জন্য খাওয়ার অভ্যাস করা দরকার, জিভের জন্য খাদ্যকে অখাদ্য বানানো ঠিক নয়, নানা মশলা দিয়ে ভেজেভুজে রাঁধলে খাবার সুস্বাদু হয় সত্য কিন্তু খাদ্যের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। খাদ্যের উপকারিতা বজায় রাখার আর সময়শক্তি বাঁচাবার জন্য গান্ধী আশ্রমে সাদাসিধে খাবার দিতেন ; ফ্যান-ভাতে, সেদ্ধসবজি, রুটি, কিছু কাঁচা স্যালাড্, ফল, দুধ বা দৈ পরিবেশন করা হত। মশলা কোটাবাটার ঝামেলা ছিল না। ভিজানো ছোলামুগ, বাদাম প্রভৃতিও খাওয়া হত। লাড্ডু-মিঠাই, ক্ষীর-সন্দেশ কিছুই মিলত না, তার বদলে গ্রামে-তৈরী তাজা গুড়, পাটালি আর মধু পাওয়া যেত। মান্যগণ্য অতিথি, বিদেশীরা এলেও বিশিষ্ট স্বাদু অন্নব্যঞ্জন দেওয়া হত না। পরদেশী সাহেব পণ্ডিত বা

মন্ত্রী, স্বদেশের জমিদার বাহাদুর বা ধনী মিলমালিক এলেও মাটির দাওয়ায় বসে সাধারণ খাওয়া খেতেন।

এক আগন্তুকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেলা হয়ে গিছল। গান্ধী তাঁকে বললেন, "যদি আমাদের আশ্রমের সাদামাটা খাওয়া আপনি খেতে পারেন তো আজ এখানেই খেয়ে নিন।" তিনি ভদ্রতা করে বললেন, "বিলক্ষণ, বহুদিন থেকে আশ্রমের রান্না খাবার সখ আছে আমার মনে।" খাবার সময় শুকনো রুটি, জলেসেদ্ধ তরকারি, কাঁচা পাতাপুতি দেখে তাঁর সখ উবে গেল। কোনমতে জল খেয়ে দুএকখানা রুটি গলাধঃকরণ করছেন দেখে গান্ধী বললেন, "আপনার কষ্ট হল! এ জাতীয় মিষ্টান্নহীন, মশলাহীন খাদ্য পূর্বে কখনও খাননি। নিশ্চয়।" ভদ্রলোক আমতা আমতা করতে লাগলেন।

এ রাঁধুনীটি রান্না করার চেয়ে সরল সহজ নিরামিষ রান্না সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছিলেন বেশী আর খাওয়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন আমরণ। মনগড়া উপদেশ তিনি দিতেন না। নিরামিষ আহার সম্বন্ধে পণ্ডিতের লেখা অনেক বই পড়ে, ডাক্তারের কাছে খাদ্যের গুণাগুণ জেনে নিয়ে, নিজের জীবনে খাদ্যের ফলাফল প্রয়োগপরীক্ষা করে অন্যকে পরামর্শ দিতেন। তাঁর অনেক সময় অগ্নিপক্ক খাদ্য খাবার দরকার হত না। পাঁচবছর ফল ও মেওয়া খেয়ে কাটিয়েছিলেন। চারমাস ভিজানো অঙ্কুরওঠা দানা খেয়ে কিন্তু তাঁর আমাশা হয়ে গিছল। বুড়োবয়সে নিজের জন্য এক অদ্ভুত খানা বাতলেছিলেন। তরিতরকারি একসঙ্গে বেটে নিয়ে সে ডেলাটা কুকারে সেদ্ধ করে খেতেন। অন্যে বিশরকম দামী সুস্বাদু খাবার খেতে দিলে তাঁর মেজাজ বিগড়ে যেত। এক ধনী বাঙালীর বাড়ী তাঁকে বহু মেওয়া ফল ইত্যাদি দেবার জন্য ভোররাত থেকে মেয়েরা ব্যস্ত-বিব্রত ছিল দেখে তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন। সেদিন থেকে তিনি জীবনের শেষ পঁচিশ বছর সারাদিনে পাঁচরকমের বেশী খাদ্যবস্তু খাননি।

ফিনিক্সবসতিতে গান্ধী হেড পণ্ডিত আর মূল পাচকের কাজ

করতেন। সাধারণত নিজের রান্না নিজেই পরিবেশন করতেন তাই কেউ আর টীকাটিপ্পনী করতে পারত না। কুমড়ো সেদ্ধ খেয়ে উত্যক্ত হয়ে কস্তুরবার পক্ষছায়ায় আশ্রয় নিয়ে আশ্রমবাসিনীরা কবিতা লিখে তাদের অরুচি প্রকাশ করেছিল একবার। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়রা ইউরোপীয়দের যে ভোজ দিয়েছিল তাতে গান্ধী পাচক-পরিবেশকের দায় নিয়েছিলেন।

ফিনিক্সবসতি থেকে যখন প্রথম সত্যাগ্রহীদল রওনা হয়েছিল তখন গান্ধী নিজে রেঁধে তাদের ভরপেট খাইয়ে দিয়েছিলেন। একা একগাদা চাপাটি, ভাত, কালিয়া, টম্যাটোর চাটনী আর খেজুরের পায়স রেঁধেছিলেন। রাঁধতে রাঁধতে তাদের জেলে কি কি লাগবে, কি অসুবিধা হবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ২৫০০ সত্যাগ্রহীর নেতা হয়ে পদযাত্রা করার সময়ও সকলকে খাওয়াবার ভার তিনি নিয়েছিলেন, তিনিই ছিলেন প্রধান পাচক। কখনও বা ভাত থাকত আধসেদ্ধ, কখনও বা ডাল হত জলবৎ তরলং। কর্মবীর গান্ধীভাইকে তারা এত ভালবাসত আর শ্রদ্ধা করত যে নিঃশব্দে সবাই সে রান্না খেয়ে নিত।

রন্ধন বিদ্যাকে গান্ধী শিক্ষার অঙ্গ বলে গণ্য করতেন এবং সগর্বে বলতেন যে টলস্টয়বাড়ীতে কিশোরকিশোরীরাও রাঁধতে জানত। দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে, শান্তিনিকেতনে আসামাত্র তিনি বাঙালী ছাত্রদের মাথায় এই স্বপাকের খেয়াল ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, ফলে তারা পালা করে পাকশালে রান্নার পরীক্ষা শুরু করেছিল। কবি এ ব্যবস্থার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া সত্ত্বেও এ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেছিলেন।

চম্পারণ সত্যাগ্রহের সময় বিহারের বহুকাল প্রচলিত জাতপাতের বিচার ভেঙে গান্ধী এক সার্বজনীন পাকশালায় কর্মীদের রান্নার বন্দোবস্ত চালু করেছিলেন। মাদ্রাজের এক ছাত্রাবাসে ভিন্নজাতের জন্য ভিন্ন পাকঘরের সঙ্গে ভিন্নমাপের মশলা সেবীর জন্য ভিন্ন রান্নার ব্যবস্থা দেখে গান্ধী অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

গান্ধী পাঁপরের মতো পাতলা খাকরা, আটার সুন্দর রুটি, খামি বা বেকিং পাউডার না দিয়ে পাঁউরুটি ও বিস্কুট বানাতে পারতেন। আশ্রমে বিস্কুট পাঁউরুটি বানাবার প্রথা চালু করেছিলেন। কিভাবে নিরামিষ কেক করতে হবে তার বিধান দিয়ে এক সহকর্মীকে লিখেছিলেন :

"আমি ঘরে-করা কুল্থে-পদ্ধতির পাঁউরুটি, বিস্কুট, মিষ্টান্ন, কেক আর পাঁপর তোমাদের পাঠিয়েছি। সেগুলো পেয়েছ কি? তুমি ঠিকমত কেক বানাতে না পারলে বুঝতে হবে হয় উনুনের খুঁত আছে নয় তুমি যথেষ্ট ঘি মেশাচ্ছ না। গমের দানা জলে ঘণ্টা তিনেক ভিজিয়ে রাখতে হবে। কেক করার সময় প্রথমে ঘি ময়দার সঙ্গে খুব ভালভাবে মিলিয়ে নিয়ে জল ঢালতে হবে, খুব ভালভাবে সবটা ঠাসতেও হবে।"

প্রায় ১৫০ জনের যোগ্য ফ্যানভাত রাঁধার কায়দা তাঁর রপ্ত ছিল। আশ্রমে এক বিশেষ ঢঙের উনুন করিয়েছিলেন, তাতে কম খরচে একসঙ্গে বহুজনের ভাত, সবজিসেদ্ধ আর রুটি করা যেত। সেঁকা গম গুঁড়িয়ে তিনি এক জাতীয় কফি করতেন, কমলার এবং শুধু কমলার খোসার মোরব্বাও করতে পারতেন। তাঁর তৈরী আজব কয়টি খাদ্যের নমুনা হচ্ছে—বাটা নিমপাতার চাটনি, ঘানির তাজা খোল ও দৈ-এর চাটনি, রাই ও অন্য কাঁচা শাকের স্যালাড, তেঁতুলগুড়গোলা ঠাণ্ডা অথবা গরম পানীয়, নুনমশলাতেলহীন সেদ্ধ সয়াবীন মাখা, মোটা আটার দালিয়া আর পিষ্টি করে গুঁড়োন সেঁকা চাপাটির পুডিং।

একজন সহকর্মী একদা বলেছিলেন, "ইদানীং কাঁগজে বেরিয়েছে যে ঘাসে খুব খাদ্যপ্রাণ আছে। সৌভাগ্যবশত এ খবরটা যখন প্রচারিত হয় তখন গান্ধীজী আশ্রমে ছিলেন না, থাকলে হয়তো রান্নার পাট তুলে দিয়ে আমাদের মাঠে চরে খেতে বলতেন।" বল্লভভাই গান্ধীর নিমপাতা, কাঁচা শাকপাতা খাওয়ার বহর দেখে বলেছিলেন,

বাপু ছাগলীর দুধ পান শুরু করেছিলেন, এখন ছাগলের খাদ্যে মন দিয়েছেন।"

একটি বিদ্যালয়ের লাগোয়া আদর্শ ছাত্রাবাস দেখতে গিয়ে গান্ধী পাকশালার বেবন্দোবস্ত লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "যখন তোমাদের সকল বিদ্যার্থীকে তোমরা বিদ্যাদানের সঙ্গে সঙ্গে পাকা রাঁধুনী আর দক্ষ মেথর তৈরি করতে পারবে তখনই এ বিদ্যালয় প্রকৃত আদর্শ প্রতিষ্ঠান হবে।

আজব হাকিম

গান্ধী রাজকোটের আলফ্রেড উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার কয়েক মাস পরেই তাঁর অভি-ভাবকরা তাঁকে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে আইন পড়াবার সিদ্ধান্ত নেন। গান্ধী একবার জিগেস করেছিলেন, "আমি কি বিলেতে গিয়ে ডাক্তারী পড়তে পারি না?" শবদেহ নিয়ে বৈষ্ণবসন্তানের কাটাছেঁড়া করা চলবে না বলে তাঁর বড়দা আপত্তি জানান। তাছাড়া তাঁর মৃত পিতা করমচাঁদের এ ব্যাপারে মত ছিল না।

ত্রিশ বছর বয়সে গান্ধী আবার বিলেতে গিছলেন; সেবারও তিনি চিকিৎসাবিদ্যা শেখার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। সেই দেহ কাটাকুটি করায় বিধিই ফের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। জ্যান্ত জীবজন্তুর দেহ কাটা বা টিকে ইনজেকশান তৈরি করার জন্য তাদের দেহে নানা পরীক্ষা করা গান্ধী সমর্থন করতেন না। তাঁর চোখে অ্যালোপ্যাথরা ছিল শয়তানের চর আর পাশ্চাত্ত্য ওষুধবিষুধ ধোঁকাবাজির নামান্তরমাত্র। আয়ুর্বেদশাস্ত্রের পণ্ডিতদের মনে নূতন নিরীক্ষা করার চেষ্টা নেই দেখে তিনি বড় ক্ষুণ্ণ হতেন, আবার হোমিওপ্যাথিতে তাঁর আস্থা ছিল না। প্রাকৃতিক চিকিৎসার ভক্ত হবার পর তাঁর রোগীর সেবা ও চিকিৎসা করার সখ মেটে।

তিনি কুন্থের বই পড়ে, জলের ব্যবহার করে রোগ সারাবার অনুরাগী হয়ে পড়েন। ধীরে ধীরে নিজের ওপর এবং স্ত্রী-পুত্রের ওপর প্রয়োগ-পরীক্ষা করার পর গান্ধী প্রাকৃতিক উপাদান—ক্ষিতি (মাটি), অপ্

(জল), তেজ (সূর্য), মরুৎ (বায়ু) আর ব্যোম (খোলা আকাশ) এর সদ্ব্যবহার করে রোগ সারাবার পদ্ধতি প্রচারে রত হন। বড়ি পাঁচন খাইয়ে শরীরে বিষ না ঢুকিয়ে তিনি পথ্যের অদলবদল ঘটিয়ে শরীর শোধরাবার পক্ষপাতী ছিলেন।

স্থিরধীরচিত্তে রোগীর অবস্থা লক্ষ্য করার বিশেষ ক্ষমতাবলে গান্ধী রোগীদের সারিয়ে তুলতে পারতেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনিই ছিলেন প্রথম কুলি ব্যারিস্টার আর কুলি হাকিম। অনেক ভারতীয় ও ইউরোপীয় রোগী তাঁর পরামর্শ নিত। তিনি তাঁর বহু মক্কেলের পারিবারিক চিকিৎসক হয়ে পড়েছিলেন। সেকালে তাঁর চিকিৎসা করার ধরন যে শুধু চলতি প্রথার বিরোধী ছিল তা নয়, উপরন্তু বছর কতক পরে পাশকরা বিচক্ষণ ডাক্তাররা যে পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতেন তার সমগোত্রীয় ছিল।

তাঁর দশ বছরের ছেলের যখন টাইফয়েড হয়েছিল তখন ডাক্তার তাকে মুর্গীর সুরুয়া ও ডিম খেতে বলেছিল। গান্ধী আমিষ পথ্য দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না বলে নিজেই ছেলের চিকিৎসার ভার নেন। রোগীকে শুধু জল ও কমলার রস খাওয়াতে থাকেন আর নিংড়ে নেওয়া ভিজে কাপড়ের ওপর কম্বল জড়িয়ে তার দেহ মুড়ে রাখেন। কিছুদিন জ্বরভোগের পর ভুল বকতে আরম্ভ করায় গান্ধী ঘাবড়ে গিছলেন তবু ঐ চিকিৎসা চালু রেখে তাকে সারিয়ে তোলেন। ফোঁড়াফুঁড়ি না করেই তিনি আরো কয়েকটি টাইফয়েড রোগীকে সুস্থ করেছিলেন। এভাবে তিনি বহুক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ-বিরোধী চিকিৎসা চালিয়েছিলেন।

কস্তুরবা একবার দুরারোগ্য রক্তহীনতা রোগে ভুগছিলেন। তাঁকে ডাক্তার গোমাংসের সুরুয়া খাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। গান্ধী ও কস্তুরবা তাতে রাজী হননি। কস্তুরবাকে গান্ধী দিনের পর দিন লেবুর জল খাইয়ে রেখেছিলেন। ডাল আর নুন খেতে মানা করায় কস্তুরবা অসতর্কভাবে বলে ফেলেন, "এসব পরামর্শ দেওয়া খুব সোজা।

তুমি কি ওসব ত্যাগ করতে পার?" গান্ধী তৎক্ষণাৎ বলেন, যদি ডাক্তারে অমন পরামর্শ দেয় তো নিশ্চয় পারি। যাহোক ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই আমি এক বছরের জন্য ডাল নুন খাওয়া ত্যাগ করব।" কস্তুরবা চোখের জল ফেলে অনুনয় করেও একজেদী স্বামীর পণ ভাঙাতে পারেননি। ফলে রোগী, চিকিৎসক উভয়ে নুন ডাল খাওয়া বন্ধ রাখেন। কস্তুরবা আশ্চর্যভাবে রোগমুক্ত হন। আর একবার গান্ধী অসুস্থ স্ত্রীকে এক পক্ষকাল কেবল উপোস করিয়ে আর নিমপাতার রস খাইয়ে রেখে রোগমুক্ত করেন।

গান্ধী কোষ্ঠ সাফ রাখার ওপর বিশেষ ঝোঁক দিতেন। শরীরে জমে ওঠা বিষ নষ্ট করার জন্য তিনি উপবাস, অর্ধ উপবাস করার এবং ডুস্ নেওয়ার ওপর জোর দিতেন। তাঁর মতে মাথাধরা, অজীর্ণ আর কোষ্ঠবদ্ধতা প্রায়শই অতিভোজন আর নিত্যশ্রম না করার কুফল। নিয়মিত ভাবে প্রতিদিন জোরকদমে কিছু দূর হাঁটা তিনি সুস্থ থাকার অঙ্গ বলে মনে করতেন। কয়েদভোগ করার সময়ও ছোট ঘেরা জায়গায় তিনি রোজ সকালসন্ধ্যা পায়চারি করতেন। শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ সম্পর্কীয় ব্যায়ামের নির্দেশও গান্ধী দিতেন। মনের অশান্তির জন্য দেহের রোগ হয় আর মন শান্ত থাকলে দেহ সুস্থ সবল থাকে এ তাঁর জানা ছিল। তাঁর বিচারে রামনাম জপ করার অর্থ ছিল দুশ্চিন্তা ত্যাগ করে ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাসী হওয়া। রামনাম যে সকল দুঃখতাপনাশের পরম ওষুধ।

প্লেগ, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, অজীর্ণ, ন্যাবা, রক্তচাপবৃদ্ধি, পোড়া ঘা, বসন্ত সারাবার জন্য এবং ভাঙাহাড় জোড়ার জন্য গান্ধী মাটির প্রলেপ প্রয়োগ করতেন। জাহাজে খেলতে খেলতে তাঁর আট বছরের ছেলে হাত ভেঙে ফেলে। জাহাজের ডাক্তার পট্টি বেঁধে দিয়ে ভাল সার্জেনকে দিয়ে চিকিৎসা করাতে বলেছিলেন। গান্ধী নিজে সে ক্ষতে মাটির প্রলেপ লাগিয়ে সারিয়ে তোলেন।

বহু রোগীকে সুস্থ করতে পারা সত্ত্বেও গান্ধী বলতেন, "আমার

চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষা অবিচল সত্য বলে মেনে নিও না।" এভাবে নতুন ধারায় চিকিৎসা করায় বিপদের ঝুঁকি আছে এ কথা তিনি মানতেন। তাঁর লেখা "স্বাস্থ্যরক্ষা" নামক বইতে তিনি অনেক দুঃসাহসী চিকিৎসার ধারা বাতলেছিলেন। দুচারটি প্রসূতি আগার, হাসপাতাল বা ডাক্তারখানা খোলার চেয়ে তিনি লোককে পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যকর অভ্যাস পালন করতে শেখাতে বেশী ব্যগ্র ছিলেন। রোগ সারানোর চেয়ে মানুষের রোগ যাতে না হয় এমন পরামর্শ দিতে তিনি বেশী পছন্দ করতেন।

অ্যালোপ্যাথী ওষুধ সর্বথা বর্জন করতেন না। সেবাগ্রামে কলেরার প্রকোপের সময়ে গ্রামবাসীরা এবং আশ্রমবাসীরা টিকে নিয়েছিল। তিনি নিজে বন্দী অবস্থায় অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন করিয়েছিলেন। অবশ্য সেজন্য তাঁকে সাধারণের কাছ থেকে সমালোচনাপূর্ণ বহু পত্রাঘাত সইতে হয়েছিল। তিনি নিজ ত্রুটি স্বীকার করেছিলেন।

প্রাকৃতিক চিকিৎসা যে সকল রোগ সারাতে পারে না তা তিনি জানতেন তবু নানা কারণে তার প্রচার চাইতেন। দেশের গরীব মানুষ সহজে এই সস্তা ও স্বদেশী ওষুধ ব্যবহার করতে পারে। সাতাত্তর বছর বয়সে গান্ধী মহা উৎসাহে উরুলীকাঞ্চনে এক প্রাকৃতিক চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। সেখানে কোনও দামী যন্ত্রপাতি ছিল না। গান্ধীর মতে, একজন সুচিকিৎসকের ওষুধপত্র সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান থাকা বিশেষ দরকার আর সে জ্ঞান জনসাধারণের হিতার্থে তার বিনামূল্যে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। চিকিৎসকদের বাঁধা মাপের এক বার্ষিক আয় ধার্য্য করা থাকবে যাতে তারা ধনী-দরিদ্র কোনও রোগীর কাছেই পারিশ্রমিক প্রত্যাশা বা দাবি করতে পারবে না। উরুলীকাঞ্চনে তিনি কয়েকদিন রোগী পরীক্ষা করে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিয়েছিলেন। একটায় লেখা ছিল: "রাজুর জন্য,—রৌদ্রস্নান, কটিস্নান, ঘর্ষণস্নান; ফলের রস আর ঘোল খাবে, দুধ বন্ধ। যদি ঘোল হজম না হয় তবে ফলের রস আর ফোটানো জল পান করবে।"

অন্যটায় ছিল: "পার্বতীর জন্য—কেবলমাত্র মৌসম্বীর রস পান করবে। কটিস্নান, ঘর্ষণস্নান, পেটে মাটির পট্টি। নিয়মিত সূর্যস্নান। এ সব নিয়ম পালন করলে সে সেরে যাবে। রামনামের মাহাত্ম্য তাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিও।"

আশ্রমে চলতি ঠাট্টা ছিল, "যদি বাপুকে কাছে পেতে চাও তো অসুস্থ হয়ে পড়ো।" আশ্রমের প্রত্যেকটি রোগীর রোগের খুঁটিনাটি খবর গান্ধী রাখতেন এবং প্রতিদিন বেড়িয়ে ফেরার সময় তাদের দেখে আসতেন। রোগীর পথ্য কিভাবে তৈরী হবে, কেমন ভাবে রোগীর গা মোছানো হবে বা দলাইমালিশ করতে হবে তার বিশদ নির্দেশ তিনি দিতেন। একদা তিনি যখন সেবাগ্রামে রোজ একঘণ্টা রোগী দেখার রেওয়াজ চালু করেন তখন আশপাশের গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ আসত। তাঁর ঢালা ব্যবস্থাপত্র ছিল, "সবজি খাও, ঘোল পিও, মাটি লাগাও।" কখনও বা তিনি রুগীর মল নিজে পরীক্ষা করতেন। রুগী যদি খুব দুর্বল না হত তো তাকে খোলা হাওয়ায় রাখতেন। খুব যত্ন নিয়ে রুগীর অবস্থান্তর লক্ষ্য করে গান্ধী দাওয়াই দিতেন। তাঁর এক সহকর্মী স্নায়বিক উত্তেজনা ঘটামাত্র রক্তচাপে কষ্ট পাচ্ছিলেন। প্রথম দিন গান্ধী তার সঙ্গে একজনকে আলোচনা বিতর্ক করতে পাঠিয়ে দিয়ে আলোচনার পূর্বে এবং পরে তাঁর রক্তচাপের মাপ নিলেন। দ্বিতীয় দিন একটা তক্তায় দাগ টেনে তাকে সেই দাগ বরাবর করাত চালিয়ে কাঠটা চিরতে বললেন; শ্রম করার আগেপরে তার রক্তচাপ মাপা হল। তৃতীয় দিন তাকে সিকি মাইল পথ ছুটিয়ে রক্তচাপ নিয়ে দেখা গেল চাপ কমে গেছে। পূর্বের দু'দিন তা বেড়েছিল। গান্ধী তাকে নির্দেশ দিলেন যে, "তোমার যখনই রক্তচাপ বাড়বে তুমি খানিক হেঁটে তা কমিয়ে নিও।"

রোগীদের ওষুধপথ্য, স্নানশুশ্রূষা সম্বন্ধে পরামর্শের জন্য যে কেউ এসে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা আলোচনার মধ্যেও গান্ধীকে প্রশ্ন করতে

পারত। জেলেও তিনি সহকর্মী বন্দীদের চিকিৎসা করার অনুমতি নিয়ে নিতেন। নামী নেতারা যাতে তাঁর নির্দেশ অমান্য করে অত্যাচার না করেন সেজন্য তিনি তাদের চোখে চোখে রাখতেন।

একবার এক হেঁপো রুগী তাঁর কাছে রোগের বিধান চায়। গান্ধী তাকে ধূমপান করতে নিষেধ করেন। তিন দিন পরেও তার অবস্থার উন্নতি হল না। সে বেচারা একেবারে নেশা ছাড়তে না পেরে লুকিয়ে দিনে দু'তিনটি সিগারেট খেত। তৃতীয় রাতে সে যেই দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাতে যাবে অমনই তার মুখে টর্চের আলো পড়ল। সে চমকে চেয়ে দেখে সামনে গান্ধী দাঁড়িয়ে। থতমত খেয়ে গান্ধীর কাছে ক্ষমা চেয়ে সে ধূমপান ছেড়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে হাঁপানিও তাকে ছেড়ে গেল। সব হাঁপানি রুগী নেতারা কিন্তু তাঁর চিকিৎসায় সুস্থ হননি। সীমান্তগান্ধী আব্দুল গফফর খানের মাথার তালুতে চর্মরোগ হয়েছিল। গান্ধীর বাতলানো ঘরোয়া দাওয়াই লাগিয়ে, রোগের চেয়ে ওষুধের জ্বালায় বিরাটদেহ পাঠানবীর কাবু হয়ে পড়েছিলেন। বল্লভভাইয়ের পায়ে একবার কাঁটা ফুটেছিল। গান্ধী তাতে ভেলা পুড়িয়ে লাগাতে বলেন। আইডিনের পরিবর্তে সে ওষুধ লাগিয়ে বল্লভভাই বলেছিলেন, "এ পোড়া ওষুধের জ্বলুনির চেয়ে আমার কাঁটার ব্যথা ছিল ভাল।"

সতর্ক শুশ্রূষাকারী

একবার দেশের কয়েকজন নেতা গান্ধীর কাছে পরামর্শ নিতে সেবাগ্রাম আশ্রমে গিছলেন। গান্ধী তখন আশ্রমের দুটি জ্বরো রুগীর মাথায় জলপটি দিতে ও তাদের কটি স্নান করাতে রত ছিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর একজন অসহিষ্ণুকণ্ঠে বললেন, "আপনার যদি সময় না থাকে তো আমরা যাই।" গান্ধী শান্তস্বরে বললেন, "এরা বড় কষ্ট পাচ্ছে, এদের সেবার বড় দরকার।" অন্যজন প্রশ্ন করলেন, এসব কি আপনাকে নিজে করতে হবে?" গান্ধী জবাব দিলেন, "আর কে করবে বল? গ্রামে গেলে দেখবে ঘরে ঘরে মানুষ জ্বরে ভুগছে। নিজেদের দৃষ্টান্ত দিয়ে গ্রামবাসীদের সেবাশুশ্রূষার কাজ শেখাতে হবে।"

কিশোরকাল থেকে গান্ধীর মনে সেবাভাব ছিল প্রবল। বিদ্যালয়ে পাঠশেষে তিনি ব্যায়ামে বা খেলাধূলোয় যোগ না দিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে অসুস্থ বাবার সেবায় লেগে যেতেন। কবিরাজী ওষুধ তৈরি করে খাওয়াতেন, তাঁর ক্ষত ধোয়াতেন, রাত জেগে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে শুতে যেতেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীর সেবা করার ঝোঁক বাড়তে থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ে সেবাশুশ্রূষার কাজে তিনি দৈনিক দু'ঘণ্টা সময় দিতেন। সেখানে তিনি ব্যবস্থাপত্র দেখে ওষুধ বানাতে শিখেছিলেন, কোন্ অসুখে কী জাতীয় ওষুধ ব্যবহার হয় তার হদিস পেয়েছিলেন। সেখানে

বহু দুস্থ অসুস্থ ভারতীয় মজুরের সঙ্গে তাঁর যোগ ঘটেছিল। এ কাজে সময় দিতেন বলে ওকালতির সকল মামলার তদারক করতে পারতেন না, বাড়তি কাজের ভার এক মুসলমান আইনজ্ঞকে সঁপে দিতেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বছর তিনেক বাস করার পর, গান্ধী স্ত্রীপুত্রদের নিয়ে যাবার জন্য রাজকোটে এসে শুনলেন তাঁর ভগ্নীপতি খুব অসুস্থ। শুশ্রূষাকারী রেখে চিকিৎসা করাবার অর্থ তাঁর বোনের ছিল না। গান্ধীর সঙ্গে তখন দেশের নামজাদা সাংবাদিক ও নেতাদের দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের দুর্দশার কাহিনী নিয়ে শহরে শহরে আলাপ চলছিল। "সবুজ পুস্তিকায়" সে সব কথা লিখে বিলি করায় তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন তবু রুগ্ন ভগ্নীপতিকে বাড়ীতে আনিয়ে আপন ঘরে রেখে গান্ধী দিবারাত্র তার পাশে থেকে সেবা করেছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্ল্যাক প্লেগ নামক মারাত্মক মড়ক দেখা দেয় সহসা। ওখানকার সোনার খনিতে বহু ভারতীয় মজুর কাজ করত। তাদের বস্তিগুলো ছিল ঘিঞ্জি আর বেশ নোংরা। তারা এই মহামারীতে আক্রান্ত হয়েছে শোনামাত্র গান্ধী চারজন সহকর্মী নিয়ে সেখানে চলে যান। কাছাকাছি কোনও হাসপাতাল ছিল না তাই তাঁরা একটা খালি গুদামঘর দখল করে, খুলিয়ে, সাফ করে কাজ চালাবার মতো হাসপাতাল খাড়া করেন। অন্যান্য বন্দোবস্তের জন্য পৌরসভাকে চাপ দেন। পৌরকর্তারা কিছু ওষুধ, বীজাণুনাশক আরক আর এক ধাত্রী পাঠায়। সে ধাত্রীর কাছে রোগপ্রতিষেধক হিসেবে যে ব্র্যাণ্ডি ছিল তার গুণাগুণের ওপর গান্ধীর একটুও আস্থা ছিল না। হাসপাতালে তেইশজন রুগী ভর্তি হয়েছিল। ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে গান্ধী তিনজন রুগীর ওপর মাটি চিকিৎসা প্রয়োগ করেন। তাদের মধ্যে দুজন সেরে উঠেছিল, বাকী সবাই, মায় সেই ধাত্রীটিশুদ্ধ মারা গিছল।

যাতে প্লেগরোগ ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য সুস্থ মানুষদের অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে সে বস্তি জ্বালিয়ে দেবার ব্যবস্থায় গান্ধী সাহায্য করেছিলেন।

যারা ভয়ে ঘাবড়ে গিছল তিনি প্রতিদিন সাইকেলে চড়ে তাদের কাছে গিয়ে ভরসা দিতেন। নিজে খুব সতর্ক থাকতেন, অধিক শ্রমের সময় কখনও ভরপেট খেতেন না। একমনে পরের সেবা করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের শরীরের ওপর নজর রেখে নিজেকে সুস্থ রাখা তিনি শুশ্রূষাকারীর কর্তব্য বলে মনে করতেন। হঠাৎ হুজুগে মেতে তিনি সেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তেন না, এ তাঁর প্রতিদিনের নিত্যকাজের অঙ্গ ছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়োর যুদ্ধ ও জুলুবিদ্রোহ এই দুই লড়াইয়ে গান্ধী ব্যাপকভাবে আর্তের সেবা করার বিশেষ সুবিধা পেয়েছিলেন। দু'বারই তিনি ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক দল গড়ে তাদের দক্ষ নেতারূপে আহতদের ক্রোশের পর ক্রোশ ডুলিতে বয়ে নিয়ে যেতেন। গোরা সৈন্যদের জন্য ডাক্তারী নির্দেশমত ওষুধও বানাতেন। জুলুদের সেবার ভার পেয়ে তিনি খুব তৃপ্ত হয়েছিলেন। রাজার জাত সাহেবরা জুলুদের কাছ থেকে বেশী কর দাবী করায় জুলুরা তা দিতে অস্বীকার করে, কয়েক-জন ক্ষেপে গিয়ে সাহেবদের আক্রমণ করে। সেজন্য তাদের ওপর খুব জুলুম করা হয়, অনেককে চাবুক মেরে আধমরা করা হয়। গৌরাঙ্গী ধাত্রীরা তাদের স্পর্শও করত না। সেবাযত্ন ওষুধের অভাবে তাদের চাবুকের ঘা পেকে পচে উঠেছিল। গান্ধী তাঁর সেবাদল নিয়ে পট্টি, মলম, প্রভৃতি দিয়ে জুলুদের শুশ্রূষা করেছিলেন। তাঁর না ছিল দুর্গন্ধের বোধ, না ছিল ঘৃণা। গান্ধীর কাজের তারিফ করে সরকার তাঁকে জুলু যুদ্ধপদক ও কাইজার-ই-হিন্দ স্বর্ণপদক পুরস্কার দিয়েছিল।

রুগীর অবস্থা মন্দ হয়ে পড়লে দিশেহারা না হয়ে, মাথা ঠিক রেখে গান্ধী সকল ব্যবস্থা করতে পারতেন। তাঁর প্রিয়জন স্ত্রীপুত্রদের শান্তমনে শুশ্রূষা করতেন। তাঁর আট বছরের ছেলে হাত ভেঙ্গে ফেলার পর গান্ধী মাসাধিককাল তার ক্ষত ধুইয়ে মাটির প্রলেপ লাগিয়ে হাত বেঁধে দিয়েছিলেন। আর একবার তাঁর টাইফয়েড জ্বরগ্রস্ত দশ বছরের ছেলের তিনি চল্লিশ দিন যাবৎ সেবা করেছিলেন। তার কাতর কান্নায় কান না দিয়ে তার দেহ কম্বল মোড়া ভিজে কাপড়ে

জড়িয়ে রাখতেন। এভাবে ক্রমশ তাকে সুস্থ করে তোলেন। তিনি রুগীদের মমতাভরে সেবা করতেন কিন্তু চিকিৎসা বা শুশ্রূষার কঠোরতায় একটুও ঢিল দিতেন না। আর এক শিশু টাইফয়েড রুগীকে এক পক্ষকাল মাটি ও জল চিকিৎসায় রেখেছিলেন। দেড়ঘণ্টা অন্তর তার পেটে এক ইঞ্চি পুরু মাটির লেপ লাগাতেন। জ্বর বন্ধ হবার পর শিশুটিকে পাকা চটকানো কলা খাবার বিধান দেন এবং সে কলা নিজে পনের মিনিট ধরে মেড়ে দিতেন। পাছে গাফিলতি ঘটে এই ভয়ে তার মাকেও এ ভার দেননি। রুগীর মনের খুশীভাবের ওপর যে তার দেহের ভালমন্দ নির্ভর করে তা তাঁর জানা ছিল। শুধু ওষুধ পথ্যের কড়া নিয়ম জারি করতেন না, গল্প করে ভুলিয়ে রুগীকে খুশী রাখতেন। অতি যত্নে এমন নিপুণভাবে সেবা করতেন যে সব রুগী তাঁকে কাছে পেয়ে খুশী হত। গান্ধী সকল নেশার বিরোধী ছিলেন তবু আশ্রমের একটি আমাশাগ্রস্ত মাদ্রাজী কিশোরের মনে কফি পান করার সখ হয়েছে শুনে, সে একটু সুস্থ হবার পর তাকে নিজে কফি তৈরি করে, বয়ে নিয়ে তার হাতে কফির পেয়ালা তুলে দিয়েছিলেন।

কস্তুরবা দু'বার দক্ষিণ আফ্রিকায় কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। ডাক্তাররা তাঁর প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়েছিল। ধৈর্য, সতর্কতা ও সাহসের সঙ্গে সেবা করে গান্ধী তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। প্রথম কয়েদ ভোগের পর ক্ষীণ দুর্বল স্ত্রীকে গান্ধী দাঁত মাজিয়ে, কফি করে খাওয়াতেন, তাঁকে ডুস দিতেন, তাঁর মলপাত্র সাফ করতেন। একবার তাঁর চুল আঁচড়ে দেবার চেষ্টাও করেছিলেন। তিনি ভোরে কস্তুরবাকে শোবার ঘর থেকে বয়ে নিয়ে গিয়ে খোলা উঠানে একটি গাছতলায় শুইয়ে দিতেন। সারাদিন ছায়া সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রোদ থেকে তাঁর বিছানা ঘুরিয়ে দিতেন।

গান্ধী ডুস দেওয়ায়, কটিস্নান করাতে, গা মোছাতে, তেল মালিশ করাতে এবং মাটির প্রলেপ ও ভিজে কাপড়ের মোড়ক দিতে বেশ পটু ছিলেন। নিজের রক্তচাপ কমাবার জন্য প্রায়ই মাথায় কপালে

মাটির লেপ লাগাতেন। ঐ অবস্থায় মানী অতিথিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনাও চালাতেন। জাপানী কবি নগুচিকে বলেছিলেন, "ভারতের মাটিতে আমার জন্ম তাই ভারতের মাটি আমি মাথার মুকুট করেছি।"

শত কাজে ব্যস্ত থাকলেও তিনি প্রতিদিন আশ্রমের রুগীদের তল্লাস করতে ভুলতেন না। সকল রোগীর পথ্য তাঁর নির্দেশে তৈরী হত, কখনও বা সে পথ্য তাঁকে দেখিয়ে তবে রুগীকে দেওয়া হত। কখনও বা তাঁর কুঁড়ে ঘরে বিদেশী মানুষরা বৈঠক করে চলে যাবার পর সেটা রুগীদের খাবার ঘরে পরিণত হত। চলতে ফিরতে পারে এমন রুগীরা তাঁর ঘরে জমা হয়ে তাঁর সামনে খেত।

রোগের ছোঁয়াচের ভয় তাঁর ছিল না। এক কুঠে ভিখারী তাঁর কাছে ভিক্ষা নিতে এসেছিল। তাকে নিজ বাসায় আশ্রয় দিয়ে, কদিন তার ঘা ধুইয়ে শুশ্রূষা করে গান্ধী তাকে হাসপাতালে ভর্তি করার বন্দোবস্ত করেন। কয়েদখানার এক সঙ্গীর দেহে কুষ্ঠের লক্ষণ দেখা দেয়। কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে গান্ধী রোজ তাকে দেখে আসতেন। পরে সে বহুবছর সেবাগ্রাম আশ্রমে থেকেছিল, গান্ধী বহুদিন যাবৎ তার ঘা ধুইয়ে পট্টি বেঁধে দিয়েছিলেন। আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী অবস্থায় কস্তুরবার শেষ অসুখের সময় গান্ধী তাঁর শুশ্রূষা করেছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ৭৫ বছর।

এই শুশ্রূষাকারী তথা বন্ধিটির যখন য়েরোড়া জেলে অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশান করা হয়েছিল তখন তাঁর ধাত্রীরা তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল। একজন বলেছিল, "ধাত্রীর কাজ সব সময় সুখময় নয় কিন্তু গান্ধীজীকে সেবা করা আনন্দ ও গৌরবের ব্যাপার। ডাক্তার আমাকে একদিন শুধালেন, 'তুমি তো আগে এমনভাবে রোগীর খবরাখবর ছেপে রাখতে না'। জবাবে আমি বলেছিলুম, 'এমন রোগীও আমি পূর্বে কখনও পাইনি'।"

বিশিষ্ট শিক্ষক

গান্ধীর জীবনে কস্তুরবা ছিলেন প্রথম ছাত্রী। বিদ্যালয়ে পাঠকালে ১৩ বছর বয়সে গান্ধীর বিয়ে হয়। তাঁর সমবয়সী স্ত্রী ছিলেন নিরক্ষর। বালক গান্ধী কস্তুরবাকে রাতে একান্তে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। সেকেলে গোঁড়া পরিবারে দিনে সবার সামনে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা চলত না। কস্তুরবার তখন মোটেই লেখাপড়া শেখার আগ্রহ ছিল না ফলে গান্ধীর গুরুগিরি বিফল হয়।

বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে গান্ধী নিজ পরিবারের বাচ্চাদের ব্যায়াম আর সাহেবী আদবকায়দা শেখানো নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। শিশুরা তাঁর প্রতি সহজে আকৃষ্ট হত দেখে তাঁর ধারণা জন্মায় যে ভাল শিক্ষক হবার যোগ্যতা তাঁর আছে।

তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণা এবং শিক্ষা দেবার পদ্ধতি চলতিধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজী জানা একান্ত দরকার বুঝে তিনি ভারতীয়দের ইংরেজী শেখাবার জন্য ক্লাশ চালাতে রাজী ছিলেন। তিনটি ছাত্র—একটি মুসলমান নাপিত, মুসলমান কেরানী আর এক হিন্দু দোকানদার—ইংরেজী শিখতে ব্যগ্র ছিল কিন্তু তারা কাজ ফেলে পড়তে আসতে পারত না বলে গান্ধী প্রত্যহ চার মাইল পথ হেঁটে তাদের পড়িয়ে আসতেন। আটমাস যাবৎ বিনা মাইনের গুরুগিরি করে তিনি তাদের কাজ চালাবার মতো ইংরেজী শিখিয়েছিলেন।

তিনি কখনও কখনও ছাত্রদের ফ্যাসাদে ফেলতেন। বাড়ীতে তাঁর ছোট ছোট ছেলেদের পড়াবার সময় তিনি দিতে পারতেন না বলে তারা আপিস যাবার সময় বাবার সঙ্গী হত। রোজ পাঁচ মাইল পথ হাঁটত আর গল্পচ্ছলে মুখে মুখে গুজরাতী সাহিত্য, কবিতা ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষালাভ করত। তাদের বিদ্যালয়ে পাঠানো নিয়ে গোল বেধেছিল। বিলেতী ধাঁচের বিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্র ভর্তি করত না। গান্ধীর বিশেষ সুযোগ পাবার ব্যবস্থা সম্ভব হত কিন্তু তিনি তা' নেননি। বিলেতী বিদ্যালয়ে গিয়ে তাঁর সন্তানরা মাতৃভাষা না শিখে ফিরিঙ্গীয়ানা শিখুক এও তাঁর কাম্য ছিল না। তাদের ইংরেজী শেখাবার জন্য অল্পকাল এক মেম শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করে, বাকী শিক্ষার ভার নিজে নিয়েছিলেন। তাঁর বাড়ীতে যে সব সাহেব বন্ধু থাকত, আসা-যাওয়া করত, তাদের কাছ থেকে ছেলেরা ইংরেজী বলা রপ্ত করেছিল।

ফিনিক্সবসতিতে গান্ধী আশ্রমবাসীদের শিশু সন্তানের জন্য একটা প্রাথমিক পাঠশালার পত্তন করেন। তিনি ছিলেন হেডপণ্ডিত, অন্য সাথীরা সহশিক্ষক। গান্ধী কোনও কাজ নিজে না করে পরকে করার জন্য উপদেশ দিতেন না। তাঁর মতে যে শিক্ষক নিজে ভীরু বা উচ্ছৃঙ্খল সে কখনও পড়ুয়াদের সাহসী বা সংযত হতে শেখাতে পারে না। তিনি যখনই অবকাশ পেতেন তখন অনেক বই পড়তেন এবং নতুন কিছু শিখে নিতেন। ৬৫ বছর বয়সে জেলে তিনি প্রথম গ্রহতারা চিনতে শেখেন।

আশ্রমবাসী পড়ুয়ারা কেউ ছিল হিন্দু বা মুসলমান, কেউ পার্শী বা খৃষ্টান। ইংরেজ, জার্মান, ভারতীয় শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকরা হাতেনাতে কাজ করায় এত ব্যস্ত থাকতেন যে কখনও বা বাগান থেকে সরাসরি কাদামাখা পায়ে ক্লাশে আসতেন। গান্ধী মাঝেসাঝে ছোট শিশু কোলে নিয়ে পড়াতেন। আমাদের কাব্যে পুরাণে গুরুগৃহের যে বর্ণনা আছে গান্ধী কতকাংশে তার নকল করেছিলেন। বিদ্যালয়টি পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে চালনা করা হলেও সেখানে অনেক কড়াকড়ি

নিয়ম পালন করা হত। মজুরদের ওপর জুলুম করে চা কোকো কফির চাষ করা হত বলে ওসব পান করা বারণ ছিল। টেনিস্ প্রভৃতি খেলে স্বাস্থ্য গড়ে তোলার বদলে তিনি দৈনন্দিন কাজের দ্বারা শরীর চালনার বিধান দিয়েছিলেন। বাল্যকালে দশে মিলে খেলাচ্ছলে কাজ করার অভ্যাস করলে ভবিষ্যতে ভারী কাজ খেলার মতো স্বচ্ছন্দে করা সহজ হবে এ বিশ্বাস তাঁর ছিল।

বই মুখস্থ করানোর চেয়ে চরিত্র গড়ে দেওয়া বেশী দরকার বিবেচনা করে গান্ধী তাদের চালচলন ও ধর্মনীতিবোধের ওপর বেশী নজর দিতেন। ছাত্র অবস্থায় বহু বই পড়ার চাপে তিনি পড়ায় রস পেতেন না একথা ভোলেননি বলে তিনি কখনও বই নিয়ে পড়াতেন না। পুঁথিগত শিক্ষার চাপে পড়ুয়াদের বুদ্ধির স্বাভাবিক বিকাশ নষ্ট করার বিরোধী ছিলেন এবং পড়া ছাত্রদের কাছে ভয়াবহ না হয়ে আনন্দজনক হোক্ এই তাঁর লক্ষ্য ছিল। শিক্ষা বলতে তিনি লিখন-পঠন ও গণন শিক্ষা বা বইয়ের বিদ্যে আয়ত্ত করামাত্র বোঝাতেন না।

শিশুদের সকল ধর্মে আস্থাশীল করতে চেষ্টা তিনি করতেন। হিন্দু ছাত্ররা মুসলিম ছেলেদের সঙ্গে রমজান মাসে রোজাপালন করত। মুসলিম ছাত্ররা সাময়িকভাবে হিন্দু পরিবারে থাকত, তাদের সঙ্গে খেত। সকলেই নিরামিষভোজী ছিল। সকলে একই প্রার্থনাঘরে বসে এক মন্ত্র উচ্চারণ করত। সকলকে মালী, মেথর, মুচি, ছুতোর আর পাচকের কাজ শিখতে হত। শিক্ষার্থীর মনে যাতে ধর্ম, জাত ও ছোট বড় পেশা সম্বন্ধে ঘৃণা বা অভিমান না জন্মায় সেজন্য তিনি সকল ধর্মের ধনীনির্ধন পড়ুয়াদের একত্রে রেখে গীতাপাঠ থেকে জুতো সেলাই শেখাতেন।

টলস্টয়বাড়ী ও সবরমতী আশ্রমে গান্ধী জুতো সেলাই শেখাতেন। যে যার মাতৃভাষার মাধ্যমে পুঁথি পড়ত। গান্ধী উর্দু ও তামিলভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা দিতেন টলস্টয়বাড়ীতে। তিনি নিজে গুজরাতী, মারাঠী, সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দু, তামিল, বাঙলা, ইংরেজী, ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষা

জানতেন। পড়ুয়াদের হিন্দি, উর্দু, তামিল ও গুজরাতী শেখান হত। প্রতি সন্ধ্যায় পিয়ানোসহযোগে কীর্তন ও খৃষ্টানভজন গাওয়া হত।

সবরমতী আশ্রমেও শিক্ষার এ ধারা চালু করা হয়েছিল। পড়ুয়াদের কাছ থেকে বেতন নেওয়া হত না। তাদের মা বাবা স্বেচ্ছায় আশ্রম তবিলে চাঁদা দিতেন। চার বছরের চেয়ে বেশী বয়সের পড়ুয়াদের আশ্রম বিদ্যালয়ের বাসিন্দা হয়ে থাকতে হত। তাদের মাতৃভাষা-মারফৎ ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ও অর্থশাস্ত্র শেখান হত। সংস্কৃত, হিন্দি এবং যে কোনও একটি দ্রাবিড়ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। উর্দু, বাঙলা, তেলেগু আর তামিলভাষায় অক্ষর পরিচয় করান হত। ইংরেজী ঐচ্ছিক বিষয় ছিল। গান্ধী নিয়মিতভাবে গীতা পড়াতেন। পড়ুয়াদের দিনে তিনবার অতি সাদাসিধে মশলাবিহীন খাবার খেতে দেওয়া হত। সাদামোটা পোশাক পরার চল্ ছিল। স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করার ওপর ঝোঁক দেওয়া হত।

গান্ধী সহশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, বলতেন, "আমাদের ছেলেমেয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে এই অতিসচেতনতা ভুলতে হবে। একত্রে শিক্ষা দিয়ে বালকবালিকাদের যা ক্ষতি ঘটবে তা মেনে নেবার জন্য আমি প্রস্তুত। অতি যত্নে তুলোর বাক্সে পুরে সন্তানপালন করা অত্যন্ত ক্ষতিকর।" যখনই আশ্রমে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে কোনও গোল ঘটত গান্ধী সে ত্রুটি শোধরাবার জন্য নিজে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ উপবাস করতেন।

আশ্রমে কাতাইয়ের সঙ্গে পিঁজাইধুনাই শেখান হত। ছোটরা এমন দু'একটা হাতের কাজ শিখত যার প্রয়োগ করে তারা তাদের শিক্ষার আংশিক খরচ জোগাতে পারত। ছুটির দিন বলে কিছু ছিল না। সপ্তাহে দু'দিন তারা নিজের কাজ করার জন্য অবকাশ পেত। কষ্টসহিষ্ণু পড়ুয়ারা বছরে তিন মাস পায়ে হেঁটে দেশভ্রমণ করতে যেত। গুজরাত-বিদ্যাপীঠে গান্ধী মুখে মুখে বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্ট ও ইংরেজী সাহিত্যের বাছা বাছা গল্প শোনাতেন।

চালু শিক্ষাধারার গান্ধী আগাগোড়া ওলটপালট ঘটাতে চেয়েছিলেন। জনকতক মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানদের উপযোগী উচ্চশিক্ষা দেশের জনগণের পক্ষে নিতান্ত অকেজো ব্যবস্থা ছিল। তাঁর নিজের ছেলেদের তিনি স্কুলকলেজে পড়াননি, জনগণের নাগালের বাইরে যে শিক্ষাব্যবস্থা তার সুযোগ নেননি। সেজন্য ছেলেদের এবং তাদের মায়ের মনে চাপা দুঃখ ছিল। এক অজানা পরদেশীভাষা ইংরেজী শেখার জন্য কিশোরবয়স্ক পড়ুয়াদের কত সময় নষ্ট করতে হয় ও মেহনত করতে হয় এবং তারা কেমন ধীরে ধীরে নিজের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি উদাসীন হয়ে যায় তা গান্ধীর নজর এড়ায়নি। বিদেশীভাষায়, বিজাতীয় শিক্ষা পেয়ে তারা ঘরে পরবাসী হয়ে পড়ে। উচ্চশিক্ষাও পড়ুয়াদের মনে ভরসা জাগায় না, আত্মবিশ্বাস আনে না। শিক্ষাশেষে তারা কি কাজ করবে ভেবে পায় না। উচ্চশিক্ষা দেশের বিভিন্ন পুরাতন কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সমন্বয় ঘটাক, নতুন জগতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যোগ রাখুক এ ইচ্ছা তাঁর ছিল।

তিনি শিশুদের লেখার আগে পড়া শেখাতে চাইতেন। ভাল হাতের লেখা তিনি শিক্ষার অঙ্গ বলে মানতেন, নিজের মন্দ ছাঁদের হাতের লেখার জন্য কুণ্ঠিতবোধ করতেন। শিশুদের প্রথমে সরলরেখা, বক্ররেখা ত্রিভুজ, পাখী, ফলপাতা আঁকতে শেখাতে বলতেন কারণ তার ফলে তারা দাগা বুলোতে না শিখে সুছাঁদ অক্ষর আঁকতে শিখবে।

চলতি প্রাথমিক শিক্ষার ধারা তাঁর চোখে তামাসাস্বরূপ ছিল। গ্রামের শিশুদের প্রয়োজনের প্রতি এ'শিক্ষার কিছুমাত্র নজর ছিল না। গান্ধী শিশুর পূর্ণবিকাশ ঘটাতে চাইতেন, তাদের বইয়ের পোকা না করে দৃপ্ত মানুষ করতে চাইতেন। তারা সুস্বাস্থ্যবান, সৎবুদ্ধিমান গ্রামবাসী হয়ে, যে কোনও জীবিকা অর্জনের যোগ্য হোক এই কামনা করতেন।

দীর্ঘ ত্রিশ বছর চিন্তা করে গান্ধী হাতের কাজের মাধ্যমে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন করেন। ৬৩ বছর বয়সে, জেলে তিনি প্রথম যে

শিক্ষাপ্রণালীর পরিকল্পনা তৈরী করেন, পরে সেটা স্পষ্টরূপ নিয়ে নয়ী তালিম বা ওয়ার্ধা শিক্ষাধারা নামে চালু হয়।

গান্ধী পড়ুয়াদের মারধোর করা বা দৈহিক সাজা দেওয়ার বিরোধী ছিলেন। তিনি একবার একটি দুরন্ত ছাত্রকে কাঠের রুল্ দিয়ে আঘাত করে অসংযম ও ক্রোধ প্রকাশ করার অনুশোচনায় কাঁপতে থাকেন। ছেলেটি আঘাতে দুঃখ পায় নি কিন্তু "বাপুর" মনে কষ্ট দিয়েছে জেনে কাঁদতে কাঁদতে মাপ চেয়েছিল। গান্ধীর জীবনে অন্যকে শারীর শাস্তিবিধানের এই প্রথম ও শেষ দৃষ্টান্ত। তিনি পড়ুয়াদের খেলায় পাল্লা দিতে উৎসাহিত করতেন কিন্তু একে অন্যকে যাতে বিদ্বেষে হারাতে পারে তার জন্য তাগাদা দিতেন না। তাঁর নম্বর দেওয়ার বিধিও ছিল বিচিত্র। তিনি সবচেয়ে ভালছেলের লেখার সঙ্গে অন্যের লেখা তুলনা করতেন না। প্রতি পড়ুয়া তার পূর্বের লেখাপড়ার কাজের চেয়ে পরে উন্নতি করলে তাকে বেশী নম্বর দিতেন। তিনি পড়ুয়াদের পূর্ণ বিশ্বাস করতেন, পরীক্ষাকালে পাহারা রাখতেন না। শিশুর স্বাধীন ব্যক্তিত্ববোধ জাগিয়ে তোলা আশ্রমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল। গান্ধী বলতেন, "ক্ষুদ্রতম শিশুটিও যেন বুঝতে শেখে যে সেও একটা কেওকেটা।"

গান্ধী ভারতের গ্রামে গ্রামে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পত্তন করতে চেয়েছিলেন। বিদ্যালয়টি, অন্তত তার শিক্ষক স্বাবলম্বী না হলে গরীব দেশে তা করা সম্ভব নয় বুঝে বুনিয়াদী শিক্ষার পড়ুয়াদের একটা কোনও কারিগরী বিদ্যা—সাধারণত কাতাই শিখতে হত। মানুষের মধ্যে সাম্য আর যথার্থ শান্তি আনতে গেলে শিশুদের নিয়ে গোড়াপত্তন করা তিনি দরকার মনে করতেন। যদি লিখতে পড়তে শিখে পড়ুয়ারা হাতের ব্যবহার ভুলে যায় কিংবা হাতের কাজ করায় লজ্জা পায় তো তেমন শিক্ষালাভের বদলে তিনি তাদের নিরক্ষর থেকে পাথর ভাঙাই করতে বলতেন।

তাঁর ছোট্ট নাতিকে তিনি কেমন করে তুলোর চাষ হয়, তকলির

চাকতি তৈরী হয়, সুতো থেকে কাপড় বোনাই হয় এবং লাটাইয়ে পাক গুণে গুণে সুতো জড়াতে হয় তা ব্যাখ্যা করে ভূগোল, প্রকৃতি-পরিচয়, গণিত, জ্যামিতি ও সভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে তালিম দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে চরকা কাটার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের চরকার গড়ন, চাকা, নলি দেখে জ্যামিতিক চৌকোণ, বৃত্ত, রেখা প্রভৃতির জ্ঞান হবে, কাঠের ও তুলোর জাতজন্ম জানতে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের জলবায়ুর সঙ্গে পরিচয় হবে, তারা ভূগোলও শিখবে। এভাবে তাদের মনে জানার ইচ্ছা ও কিছু গড়ে তোলার আনন্দ জন্মাবে।

ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তাঁর বহুবার আলাপ আলোচনা কালে এবং গুজরাত বিদ্যাপীঠের সমাবর্তন উৎসবের বক্তৃতায় গান্ধী বলেছিলেন যে ভাল চাকরি পেয়ে গদীতে বসার জন্য পড়ুয়াদের তিনি শিক্ষিত করতে চান না। তিনি চান যে তারা জাতীয় জীবন শক্তিমান করুক, দেশের বীর যোদ্ধা হোক। গ্রাম্যচাষীর জীবন যাত্রার সুখদুঃখের খোঁজ রেখে চাষীদের দুঃখ ঘোচাবার চেষ্টা করাও তাদের কর্তব্য। তবেই জনগণের মন থেকে অসহায়ভাব ও কুসংস্কার দূর করা সম্ভব হবে।

রাস্কিন, টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসম্পর্কীয় ভাবধারার দ্বারা গান্ধী প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। জগতে শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এমন গণ্যমান্য মানুষের মধ্যে গান্ধী একজন। তিনি বিহারে কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাঙলায় জাতীয় বিদ্যায়তন এবং আহমেদাবাদে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

অনেক আজগুবি বিশ্বাসী এই শিক্ষকটি যৌবনে আর্জি করে ৭৫ টাকা বেতনের একটি শিক্ষকপদ লাভ করতে পারেননি। তখন তিনি লণ্ডন ম্যাট্রিক পাশ ও ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও গ্র্যাজুয়েট নন বলে তাঁর আর্জি মঞ্জুর হয়নি।

তৎপর তাঁতী

গান্ধী ৬৪ বছর বয়সে গ্রেপ্তার হবার পর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তাঁকে জিগেস করেন, "আপনার পেশা কি ?" গান্ধী উত্তরে বলেছিলেন, "আমি চাষী, কাটুনী ও তাঁতী।" এ ঘটনার বছর পঁচিশ আগে গান্ধী "হিন্দ্ স্বরাজ" নামে যে বই লিখেছিলেন তাতে স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করার ও ভারতকে ঘরে-বাইরের শোষণ থেকে মুক্ত করার ওপর জোর দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি কাপড়-বোনা তাঁত চোখে দেখেননি, তাঁত ও চরকার মধ্যে কি পার্থক্য তাও জানতেন না। অথচ এটা জানতেন যে কলে-বোনা বিলেতী কাপড় ভারতে আমদানি হবার পর থেকেই দেশের তাঁতীদের মহা দুর্গতি ঘটেছে। বিদেশী সৌখীন সজ্জার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে ভারতীয়রা স্বদেশে পরদেশীর শাসন কায়েম করায় সাহায্য করেছিল। ক্রমশ তিনি তাঁতীদের সম্বন্ধে বহু খবর জোগাড় করেছিলেন। তিনি বই পড়ে জেনেছিলেন যে তাদের মিলের কাপড়ের চাহিদা বাড়াবার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী—রাজার জাত পরদেশী বণিকরা—দেশী তাঁতীদের কাজ কারবার অচল করে দিয়েছিল, নানা উৎপীড়ন করেছিল। তাঁতীদের নামমাত্র মজুরি দিয়ে জুলুম করে খাটাত বলে তাঁতীরা যে নিপুণ আঙুল চালিয়ে ঢাকাই মসলিন ও সবনম বুনত সেই আঙুল কেটে ফেলেছিল।

দু'শো বছর আগে, ভারত থেকে নানা দূর বিদেশে ত্রিশ লাখ টাকার কাপড় রপ্তানি হত। ইংরেজ ভারতে ৪০ বছর রাজত্ব করার পর ভারতীয় কাপড়ের রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। একশো বছর বাদে ব্রিটেনের তৈরী

কাপড়ের চারভাগের এক ভাগ মাল—ষাট কোটি টাকার বিলেতী বস্ত্র ভারতে আমদানি হতে থাকে। ভারতের বিশ্ববন্দিত তাঁতশিল্প ধ্বংস হয়ে যায়, বেকার তাঁতীরা চাষ করতে থাকে, অর্থাভাবে মরতে থাকে। পৃথিবীর বাণিজ্য জগতে এমন দৃষ্টান্ত আর খুঁজে পাওয়া না। এক বড়লাট লিখেছিলেন যে "তাঁতীদের অস্থির শ্বেত আবরণে ভারতের শ্যামলভূমি ছেয়ে যাচ্ছে।"

গান্ধী জেনেছিলেন যে বাঙলার মসলিন-বুনিয়ে তাঁতীরা বেকার হয়ে গিছল, পাঞ্জাবের তাঁতীরা কাজ অভাবে তাঁত ছেড়ে তলোয়ার বন্দুক ধরতে শিখেছিল, কারুকার্যময় শিল্পকলা রচনা তাদের চোখে তুচ্ছ হেয় হয়ে গিছল। হাতের কৌশলে সুতো থেকে সুশ্রী সুন্দর কিছু গড়ে তুলতে ভুলে গিয়ে তারা সৈনিকের পেশা বেছে নিয়ে মানুষের প্রাণ হরণ করার বিদ্যেয় তালিম নিতে লাগল আর গুজরাতের বহু তাঁতী পেটের দায়ে দেশত্যাগ করে সুদূর শহরে মহানগরে মেথরের কাজে লেগে গেল। অনেক মেয়েও মেথরানী হল। তাদের ঘর সংসার ভাঙল, ইজ্জৎ গেল, শান্তি, স্বাস্থ্য, চরিত্র, নষ্ট হল। মদ, জুয়ার নেশায় তাদের পেয়ে বসল, মনুষ্যত্ব খোয়া গেল।

গান্ধী দেশের এই পরনির্ভরতা, এই বিদেশী বস্ত্র আমদানির চলন বন্ধ করার দৃঢ় সঙ্কল্প নিলেন এবং স্বরাজের ভিত্তি স্বদেশীয়ানার পত্তন করায় বদ্ধপরিকর হলেন। দেশবাসীকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করা তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে উঠল। শ্রমিকরা দেশঘরের বন্ধনচ্যুত হয়ে কলের পুতুল বনে যায়। গান্ধী বলতেন, "আমাদের রুচি বিকৃত হয়ে না পড়লে আমরা গায়ে-সেঁটে-থাকা ক্যালিকোর কাপড়ের বদলে খাদি পছন্দ করতুম। এক ধরনের শিল্প প্রাণদাত্রী আর অন্য ধরনের শিল্প প্রাণনাশী। বিদেশী কলের মিহি কাপড় আমাদের হাজার হাজার ভাইবোনকে বেকার করেছে। তাছাড়া পাইকারীমাপে তৈরী কলে-গড়া মাল শিল্পীর সৃজনীশক্তি, শিল্পীমনও বিশেষ কিছু গড়ে তোলার কলাকৌশল ও আনন্দ নষ্ট করে দেয়।" মিল চালাবার

মূলধন জোগায় পুঁজিপতি মালিকরা, তার জটিল যন্ত্রপাতি আসত বিদেশ থেকে। মিলে শ্রমিকরা শোষিত হয়, বহু লোক হাতের কাজ ভুলে যায় বলে গান্ধী দেশের কাপড়-কলের সংখ্যা বাড়াতে চাননি। বছরে ষাট কোটি টাকার বিদেশী কাপড়ের আমদানি রদ করার জন্য তিনি কয়েকটা সর্ত রাখেন। তিনি হাতে ও পায়ে চালানো দেশী তাঁতের ব্যবহার জনপ্রিয় করার চেষ্টায় রত হন। এসব বিষয় ব্যাখ্যা করে তিনি বই লিখলেন, কাগজে প্রবন্ধ লিখলেন, সভায় সভায় বক্তৃতা দিতে থাকলেন। নিজে তাঁত বোনা শিখলেন। আহমেদাবাদ তাঁতশিল্পের কেন্দ্র ছিল বলে ভারতে ফিরে সেখানে সবরমতী আশ্রমের পত্তন করেছিলেন। সেখানে আশ্রমবাসীদের স্বদেশীব্রত পালন করতে হত, আশ্রমের তাঁতে বোনা কাপড় পরতে হত। আশ্রমের নির্দেশ ছিল— "নিজের কাপড় নিজে বোনো, নচেৎ বিন্ কাপড়ে চালাও।" পটু তাঁতী এনে আশ্রমবাসীদের নিয়মিত তাঁত চালাবার কৌশল শেখাবার ব্যবস্থা গান্ধী করেছিলেন। ৪৫ বছর বয়সে তিনি প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে চারপাঁচ ঘণ্টা তাঁত চালিয়ে কাপড় বুনতেন। ধীরে ধীরে এক বছরে আশ্রমে চোদ্দটা তাঁত চালু হয়েছিল। প্রতি শিক্ষানবীস তাঁতী দৈনিক আটঘণ্টা তাঁত চালিয়ে আনা বারো মতো মজুরি উপার্জন করত। আশ্রমের তাঁতে প্রথমে খাটো বহরের কাপড় বোনা হত, মেয়েরা সে কাপড় জুড়ে শাড়ী বানাত। পরে শাড়ীর উপযোগী বড় বহরের কাপড় বোনার ব্যবস্থা হয়।

শুধু তাঁতী হয়ে গান্ধী তুষ্ট হলেন না। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে ভারতের এবং ব্রহ্মদেশের তাঁতীরা পটু বুনিয়ে হলেও, অনেক সময় সুতোর অভাবে কাজ পায় না, কলে-তৈরী সুতোর জন্য পরনির্ভর হয়। তাদের স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে এবং তাঁতীদের সঙ্গে সঙ্গে কাটুনীদের মজুরি জোগাবার জন্যে গান্ধী কেবলমাত্র চরকায়-কাটা সুতোয় খাদি কাপড় বোনার ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি নিজে হাতে-কাটা সুতো থেকে হাতে-বোনা চাদর, কপনি ব্যবহার করতেন।

গান্ধী তাঁতার কাজ দিয়ে স্বদেশীব্রত পালন আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু কাটুনীরা সুতোর জোগান না দিলে তাঁত অচল হবে জেনে চরকা চালানোর ওপর বেশী ঝোঁক দিয়েছিলেন। নিজেও দক্ষ কাটুনী হয়ে উঠেছিলেন।

পেশাদার তাঁতীরা হাতে-কাটা সুতো বুনতে বেশী মজুরি চাইত। মিলের সুতো বোনাই করা সহজ বলে তারা হাতে-কাটা সুতো পছন্দ করত না। ভারত স্বাধীন হবার পর একজন কর্মী বলেছিলেন যে, কাটুনীদের সাহায্যার্থে সরকারের কিছু টাকা দেওয়া উচিত অথবা খানিক হাতে-কাটা সুতো বুনাই করার পর প্রত্যেক তাঁতীকে কলের সুতোর জোগান দেওয়া যুক্তিযুক্ত। গান্ধী এ প্রস্তাব সমর্থন করেননি কারণ বাধ্যতামূলক চাপে লোকের মনে খাদির প্রতি বিরাগ জন্মাবে, তাঁতীরা বিদ্রোহ করতেও পারে। তাঁতীরা যাতে স্বচ্ছন্দে বুনতে পারে সেজন্য তিনি চরকার সুতোর উন্নতি ঘটাতে বলেন, ডবল পাকের দোসুতির কাপড় বোনার সমর্থন করেন। তাঁতীদের এটুকু সাবধানবাণী শুনিয়ে দেন যে মিলের সুতোর ওপর নির্ভরশীলতা আখেরে তাদের পেশা নাশ করবে। মিলমালিকরা বিশ্বহিতৈবী নয়। যেই তাদের মনে তাঁতীদের সঙ্গে পাল্লাপাল্লির শঙ্কা জন্মাবে, তারা তাঁতীদের সুতোর সরবরাহ কমিয়ে দেবে। নিজ ত্রুটি স্বীকার করে বলেছিলেন, "যদি আমরা ব্যাপকভাবে বুনাই কাজ চালু রাখতুম তো এ বিপত্তি ঘটত না, হাতে-কাটা সুতোর বোনাই নিয়ে ঝঞ্ঝাট বাধত না। চরকা কাটার মতো চরকার সুতো বোনাই করতে শেখার ওপর আমার সমান জোর দেওয়া উচিত ছিল। এ আমারই ভুল।"

কৃতী কাটুনী

গরীব মানুষের দুটো জিনিসের খুব দরকার—খাওয়া আর পরা। বিদেশী আমদানির ওপর নির্ভর না করে দেশের মানুষেরা যাতে নিজেদের এ সব চাহিদা মেটাতে পারে গান্ধীর সেদিকে লক্ষ্য ছিল। তিনি যখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে আসেন তখন আমাদের দেশে চরকায় সুতোকাটার চলন বন্ধ হয়ে গিছল, চরকা কি বস্তু অনেকেই জানত না। একদা গ্রামের ঘরে ঘরে যে চরকার গুঞ্জন শোনা যেত গান্ধী সেই পরিত্যক্ত উপেক্ষিত চরকার সন্ধান করতে থাকেন। এক মহিলা কর্মীর চেষ্টায় একটি চালু চরকা খুঁজে পাওয়া যায়। কাটুনীরা জানাল যে তারা যদি নিয়মিত পাঁজ পায় তো আবার সুতো কাটতে রাজী আছে। তখন তুলোর পাঁজের সমস্যা দেখা দিল। গান্ধী প্রথমে গ্রামের কাটুনীদের কলে-ধোনা পাঁজ সরবরাহ করতে থাকেন, নিজেও কলে-তৈরী সুতো থেকে কাপড় বুনতে শেখেন। এভাবে প্রকৃতপক্ষে স্বাবলম্বী হওয়া যায় না বুঝে, অনেক খোঁজাখুঁজি করে তিনি ধুনুরী, কাটুনী ও তাঁতীর সাহায্য নিয়ে খাদির পুনর্জন্ম ঘটান। কাপাস তুলোর চাষ করা থেকে শুরু করে, পেঁজাই, ধোনাই কাতাই ও নাই শিখেছিলেন।

প্রায় ৫০ বছর বয়সে অসুস্থ অবস্থায় চরকার গুনগুনানি শুনে তাঁর খুব তৃপ্তি হয়। অচিরে তিনি চরকা কাটতে শিখে নেন এবং প্রতিদিন আধঘণ্টা সুতো না কাটতে পারলে অন্ন গ্রহণ করবেন না এই প্রতিজ্ঞা করেন। তাঁর বিচারে চরকা-কাটা পুণ্যব্রতস্বরূপ ছিল। প্রায় বিশ-

বছরযাবৎ, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এ ব্রত পালন করেছিলেন। তিনি ভাল কাটুনী ছিলেন। তাঁর কাটা সুতো খুব মিহি হত না কিন্তু সমান ও মজবুত হত। সফরকালে চলন্ত ট্রেনে বা দোলায়মান জাহাজে তিনি সুতো কাটতেন, জনসভায় মঞ্চে বসে কথা কইতে কইতে চরকা চালাতেন। তিনি সব্যসাচীর মতো দুহাতে চরকা চালাতে পারতেন, ধনুষ তকলি ও তকলিতে সুতো কাটায় তাঁর হাত পাকা ছিল। একবার মাস কয়েক ডানহাতে ব্যথা হয়েছিল, তখন বাঁহাতে চরকা চালিয়েছিলেন। সারাদিন আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত থাকলে মাঝরাতে সুতো কেটে নিতেন।

গান্ধীই সঙ্গে একবার বহুক্ষণ আলোচনা করার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক সময় নষ্ট করেছেন বলে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন। গান্ধী স্মিতহাস্যে বলেছিলেন, "উহুঁ তা ঘটেনি, আমি তো সমানে সুতো কেটে যাচ্ছিলুম। প্রতিদিন আমি যে কয়দণ্ড সুতো কাটি তখন দেশের ধনবল বাড়াই বলে মনে করি। দৈনিক এককোটি লোক মাত্র এক ঘণ্টা সুতো কাটে তো দেশের ধনভাণ্ডারে রোজ ৫০,০০০ টাকা জমা হয়। চরকা কোনও মানুষের আপন পেশার কিছুমাত্র ক্ষতি ঘটায় না।"

গান্ধী চেয়েছিলেন যে গরীবরা নিজের কাটা সুতোয় বোনা কাপড় পরুক, স্বাবলম্বী হোক আর ধনীরা চরকাকাটার নিত্যব্রত পালন করে তাদের সুতো দান করুক। দেশের কোনও মানুষই এ যুগের এ কর্মযজ্ঞ এড়িয়ে যাক এ তিনি চাইতেন না. বল্লেই রমন ও রবীন্দ্রনাথের মতো গুণীপণ্ডিতদের সুতো কাটতে বলতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে আমির ও ফকির উভয়েই যেমন খায় পরে তেমনই তাদের উভয়েরই কিছু শ্রম করা দরকার। বলতেন, "আমি যে সুতো কাটি তার পাকে পাকে ভারতের ভাগ্যের চাকা ঘুরছে এ বিশ্বাস আমার আছে। চরকায় সুতো না কাটলে আমাদের দুর্ভাগা দেশের মুক্তি ঘটবে না।" ছাত্রদের বলেছিলেন, "তোমরা একগজ খাদি পরলে গরীবের হাতে দু'টো

পয়সা যায়। হাতে-কাটা মোটা খাদি সাদাসিধেপনার পরিচায়ক, খাদির এক বিশেষ সত্তা আছে।"

স্বদেশী প্রচারের নামে হিজিবিজি খাদি বুনিয়ে লোকের রুচি নষ্ট করায় তাঁর বিশেষ আপত্তি ছিল। তাঁর জীবদ্দশায় খাদির কাটতি বাড়াবার জন্য তিনি ক্রেতার মন ভোলাবার দিকে লক্ষ্য না দিয়ে, খাদিভাণ্ডারগুলিকে তাদের মনে সুরুচি জাগাবার দায় বহন করতে বলতেন। সুশ্রী ছকছাপ বেছে, সুষম রঙে ছাপাই করার পরামর্শ দিতেন। খুব সাদা দেখাবে বলে খাদির আড়ন ধোলাই করারও পক্ষপাতী ছিলেন না। কোন্ সুতো কত নম্বরের, কোন্ সুতোর পাক কত শক্ত তা বুঝতেন আবার দু'টো নলির সুতো পাকিয়ে শক্ত দোসুত করার কায়দাও জানতেন। আশ্রমের তাঁতবিভাগের হবু তাঁতীদের এসব শিখতে হত।

গ্রামের যে সব মানুষ বছরে চারছ'মাস বেকার থাকত তাদের তিনি সুতো কাটতে বলতেন। এই আধুনিক কলকব্জার যুগে সুতোকাটার মতো পুরানো শিল্পের চল্ করার এ চেষ্টাকে সমালোচকরা বিদ্রূপ করত। উত্তরে গান্ধী বলতেন, "হাতের ছুঁচ এখনও সেলাই কলের কাছে হার মানেনি। টাইপকরার কল উদ্ভাবিত হওয়া সত্ত্বেও হাত লেখনী চালাবার কায়দা ভোলেনি। কাপড়ের কল ও চরকা দুয়েরই জগতে ঠাঁই আছে। চরকা সবাই চালাতে পারে, ক্ষুদ্রতম গ্রামের কোণে বসেও চাষী তা চালাতে পারে। কাপড়ের কল আমাদের বিপুল জনসংখ্যার অতি অল্প মানুষকে কাজ দিতে পারে।"

১৯২১ সালে অসহযোগ ও বিদেশীবর্জন আন্দোলন চালু করার আগে, যখন নানা পরামর্শের জন্য তাঁর কাছে নানা মানুষ আসত, তখন তিনি চরকা চালিয়ে কিভাবে তিনি ও তাঁর স্ত্রী আপন প্রয়োজনীয় কাপড়ের উপযোগী সুতো কাটেন তা দেখাতেন। দিনের পর দিন তিনি চরকাকাটা সম্বন্ধে সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন, পত্র পত্রিকায় লিখেছিলেন। এভাবে তিনি তখন সারাদেশকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন।

মতিলাল নেহরুর মতো বিলাসী মানুষ তাঁর দামী সৌখীন বিদেশী বস্ত্রপোশাক জ্বালিয়ে দিয়ে খাদি পরা শুরু করেন এবং একদা এলাহাবাদের রাজপথে খাদি ফেরি করেছিলেন। হাজার হাজার মানুষ এ পথের পথিক হয়েছিল।

খাদির কাজ ভালভাবে চালাবার উদ্দেশ্য গান্ধী ১৯২৫ সালে নিখিলভারত চরকা সঙ্ঘ স্থাপনা করেন। তার কিছুকাল পরে দেশে ৫০,০০,০০০ চরকা চালু হয়, ১৫০০ গ্রামে প্রায় ৫০,০০০ কাটুনী ছাড়া বহু তাঁতী, রঙাই-ছাপাইয়ের কারিগর এবং দর্জিরা কাজ পেয়েছিল। তকলি, চরকা তৈরীর কাজে অনেক ছুতোর কামার সামিল হয়ে অর্থ উপার্জন করেছিল। চরকা আবার দীনদুঃখী ক্ষুধার্তের অন্নদাতা, অসহায় অনাথ স্ত্রীলোকের জানমানের রক্ষাকর্তা হয়ে উঠেছিল। পাঁচ বছরের মধ্যে একলাখের বেশী কাটুনী কাজে যুক্ত হয় এবং খাদির উৎপাদন ও বিক্রি বেড়ে যায়। গান্ধী বলতেন, "এই ছোট্ট ঘরোয়া কলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে আমার জানা এমন কোনও কল নেই। আমি এমন কোনও দ্বিতীয় সংস্থার কথা জানি না যা ১৮ বছরের মধ্যে চরকাসঙ্ঘের মতো অল্প পুঁজি নিয়ে লাখ লাখ অভাবী স্ত্রীপুরুষের হাতে চার কোটি টাকার মজুরি তুলে দিতে পেরেছে।" দু'একটি পরিবার এক পাই তুলো কিনে কাজ শুরু করেছিল, পরদিন সুতো বেচে দুনো পয়সার তুলো কিনেছিল। এভাবে তারা ধীরে ধীরে নিজের হাতে-কাটা সুতোর কাপড় পরতে পেরেছিল।

আগে দেশে বড় বড় ভারীমাপের পাতিচরকার চলন ছিল। সে বস্তু নিয়ে চলাফেরা করা দুষ্কর। সহজে সঙ্গে নেওয়া যায়, বেশী সুতো কাটা যায় এমন চরকা বানাবার জন্য একলাখ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। একজন কর্মী বাক্স-চরকার কাঠামো গড়েন। য়েরোড়া জেলে সেটা নাড়াচাড়া করে, অদলবদল ঘটিয়ে গান্ধী এখনকার বাক্স-চরকার রূপ দিয়েছিলেন বলে এর নাম হয় য়েরোড়া চক্র। আরো সস্তা ও সহজ যন্ত্র লাগানো ধনুষ তকলিতে গান্ধী সমান গতিতে সুতো কাটতে পারতেন।

গত মহাযুদ্ধে কাপড়ে টান পড়েছিল, মাথাপিছু ক'গজ মিলের কাপড় মিলত। গান্ধী ও তাঁর অনুচররা ব্যবহারযোগ্য কাপড় নিজেরাই করে নিতে পারতেন, সরকার বা কলের মালিকদের সরবরাহের মুখাপেক্ষী তিনি ছিলেন না। তিনি কস্তুরবার শাড়ীও করে দিয়েছিলেন। কস্তুরবা প্রতিদিন সুতো কাটতেন।

একজন অনুযোগ করে বলেছিল যে কাটুনীরা দৈনিক মাত্র দু'চার আনা মজুরি পায়। জবাবে গান্ধী লিখেছিলেন, "গড়ে ভারতে মাথাপিছু আয় মাত্র তিন পয়সা। যদি চরকার সাহায্যে আমি সেই সামান্য আয়ে আরো তিন পয়সা জুড়ে দিতে পারি তো চরকাকে কামধেনু বলব না কি ?" গ্রামের গরীব মেয়েদের ও অন্য কাটুনীদের মধ্যে অনেকে দিনে দশ মাইল পথ হেঁটে এসে সুতো কেটে মাত্র দু' পয়সা রোজগার করত; তাদের আয় বাড়াবার জন্য গান্ধী খাদিসঙ্ঘকে চাপ দিয়েছিলেন। ফলে দৈনিক মজুরি কমপক্ষে তিনআনা ধার্য হয়েছিল।

কেবলমাত্র মজুরি লাভের সাধন হিসেবে গান্ধী চরকার মূল্য যাচাই করতেন না। চরকা জনসাধারণের মধ্যে আত্মশক্তি ও স্বাবলম্বনের ভাব জাগায়, সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করতে শেখায় আর মানুষে মানুষে আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করে বলে তার কদর করতেন। তাঁর চোখে চরকা শ্রমের মর্যাদাবোধ, অহিংসা, নম্রতা, স্বাধীনতা ও সেবার প্রতীক ছিল। দেশজ মালমশলা দিয়ে যে চরকা সহজে তৈরী হয়, যা গড়তে সারাতে বিশেষজ্ঞের কৌশল লাগে না তা চালনা করলে হাত সূক্ষ্মকাজে পটু হয়ে ওঠে। চাষ আবাদ করে তা হয় না। এই সুন্দর গঠনমূলক কলা আয়ত্ত করা সহজ, খুব নামী-দামী শিক্ষকের কাছে এ বিষয়ে তালিম নিতে হয় না। গ্রামের কুটিরে বসে বুড়োবুড়ীরা, দুর্বল মানুষরা বা পাঁচবছরের শিশুরাও চরকা কাটতে পারে।

একজন সমালোচক গান্ধীকে প্রশ্ন করেছিলেন যে ভারতবাসী এমন সূক্ষ্ম সুতো কেটে কাপড় বানাত যা দেশের কাপড়ের অভাব

মিটিয়ে দূর বিদেশে চালান যেত, কলের কাপড়কে হার মানাত তবু কেন ভারত দুঃখী হল, পরাধীন হল! গান্ধী বুঝিয়ে বলেছিলেন, "পুরাকালে চরকার সঙ্গে স্বাধীনতার বা স্বরাজের স্বপ্ন জড়িয়ে ছিল না। দাস্যভাবে গরীবরা সুতো কাটত। তখনকার মালিকদের কাছ থেকে গরীব মেয়েরা একখণ্ড শুকনো রুটি বা কড়িদামড়ি পাবার জন্য পেটের দায়ে এ কাজ করত। আমাদের বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করে এ কাজ করতে হবে, সুতোকাটা সম্বন্ধে সমস্ত খুঁটিনাটির বৈজ্ঞানিক জ্ঞান রাখতে হবে। কলের পুতুলের মতো চরকার চাকা ঘোরানো চিত্তহীন মালাজপের মতোই নিরর্থক। চরকার এই প্রাণহীন ব্যবহার লোপ পাওয়া দরকার।"

চরকার শিক্ষাধর্মী গুণের ওপর জোর দিয়ে গান্ধী বুনিয়াদী শিক্ষকদের বলেছিলেন যে চরকা হচ্ছে জনসেবার সাধন, এটা ছুতোরগিরি মৃৎশিল্প বা ছবি আঁকা প্রভৃতির মতো কেবলমাত্র একটা কারিগরী শিল্প নয়। এই চরকা-সূর্যের চারপাশে অন্য সকল কুটির-শিল্পগুলি গ্রহের মতো ঘুরছে। কিভাবে পড়ুয়ারা লাটাইয়ে জড়ানো সুতোর ফের গুণে অঙ্ক শিখবে, কোথায় কখন প্রথম তুলো জন্মেছিল, কোন্ জমিতে তা ভাল জন্মায়, ভিন্ন ভিন্ন দেশে বস্ত্রশিল্প কিভাবে বিকাশলাভ করে, পরস্পরের মধ্যে লেনদেনের সূত্রপাত ঘটায়—এ সব ব্যাখ্যা করার সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতিপরিচয় শেখানো যায় তা গান্ধী শিক্ষকদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তকলি কাটার সময়, তকলির চাকি কেন পিতলের হয় ও বিশেষ মাপের হয়, ডাণ্ডা ইস্পাতের হয় এসব বলে জ্যামিতি ও গণিতের জ্ঞান জন্মিয়ে দেওয়া যায়।

গান্ধীজয়ন্তী চরকাজয়ন্তীর সঙ্গে এক হয়ে গিছল বলেই গান্ধী সারাভারত জুড়ে গান্ধীজয়ন্তী পালন করায় অমত করেননি। খাদি ও সুতোকাটা জনপ্রিয় করার সুযোগ তিনি হারাতেন না। তিনি একটিবারমাত্র কংগ্রেস সভাপতি হয়ে সভ্যদের বার্ষিক চার আনা চাঁদার পরিবর্তে হাতে-কাটা সুতোয় চাঁদা দেবার নিয়ম প্রবর্তন

করেছিলেন। প্রত্যেক সভ্যকে রোজ অন্তত আধঘণ্টা সুতো কেটে নির্দিষ্ট মাপের সুতো খাদিবোর্ডে পাঠাতে বলেছিলেন। যখন লোকেরা নালিশের সুরে বলত যে তারা সুতোয় চাঁদা জোগাতে পারবে না, গান্ধী বলতেন, "সুতো না কাটলে খাদি মিলবে কি করে?"

দেশে কাপড়ের আকালের ভয়কে গান্ধী আমল দিতেন না কারণ ভারতে যথেষ্ট তুলো জন্মায় আর কাজ করার যোগ্য বহু বেকার হাত আছে। ঘরে ঘরে তকলি অথবা চরকা নামক ছোট্ট কল চালালেই কাপড় করার যোগ্য প্রচুর সুতো তৈরী হতে পারে।

সুতোকাটার ফলে তিনি দরিদ্রনারায়ণের আত্মীয় হয়ে উঠছেন এই বিশ্বাসবলে ওটা ক্রমশ তাঁর অন্তরের তাগিদ হয়ে উঠেছিল। জেল-হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের পর তাঁর মুক্তির খবর পাবামাত্র বলেছিলেন, "রোগীদের ব্যবহার্য এই (মিলের) কাপড়গুলো সরিয়ে নিয়ে আমাকে খদ্দর এনে দাও, এ আমার গায়ে ফুটছে।" এ কথাও বলেছিলেন যে "মন্থর গতিতে চলে বলে চরকার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হতে আমার জন্ম-জন্মান্তর লাগবে। তোমরা যদি আমাকে ত্যাগ কর বা হত্যা কর তবু আমি চরকা ত্যাগ করব না।"

বিচারশীল ব্যাপারী

গান্ধী একদা বলেছিলেন, "আমি জাতে বেনে, আমার লোভের সীমা নেই।" এই বণিকপুত্রটিকে বাপের গদিতে বসে দেওয়ানগিরি করার জন্য শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করা হয়েছিল। তিনি কিন্তু ত্যাগব্রতীর জীবন কাটাতে মনস্থ করেন। তথাপি তাঁর মনের বেনেমি চিরজাগরূক ছিল।

হিসেবী মানুষ হলেও তাঁর নজর সস্তা টিঁকসই অথচ রুচিপূর্ণ জিনিসের ওপর পড়ত। তিনি সকল বিলাসিতা বর্জন করে, দামী জিনিসের ব্যবহার ত্যাগ করে, নিজের তৈরী খাটো কাপড়, মোটা চাদর আর হাতে-তৈরী মজবুত চটি ব্যবহার করতেন। তাঁর স্ত্রীপুত্রদেরও সাদামাটা মোটা খাদির বেশবাস পরাতেন। গান্ধী পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত খেতেন না। দু'একখানা শুকনো রুটি, ফ্যানভাত, সেদ্ধ সব্‌জি, কাঁচা পাতাপুতির স্যালাড, ছাগলীর দুধ, গুড় বা মধু আর ফল খেতেন। দিনে রাতে মিলিয়ে মাত্র পাঁচরকমের বেশী খাদ্য খেতেন না।

এক ধনী জমিদার তাঁকে একবার সোনার রেকাবে খেতে দিয়েছিলেন, তাতে গান্ধী অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। ভারতের মতো গরীব দেশে, যেখানে সাধারণ মানুষরা দিনে এক আনা আয় করে সেখানে গহনা বা সৌখীন সাজসজ্জার জন্য টাকা পুজি করে রাখা তাঁর চোখে মহাপাপ বলে মনে হত। তাঁর স্ত্রীর অঙ্গে কোনও গহনা ছিল না।

গান্ধী তাঁর চার ছেলেকে কোনও বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে ভারতের

দীনদুঃখীরা যার নাগাল পায় না এমন ব্যয়বহুল শিক্ষা দেননি। তিনি নিজেই তাদের পড়াতেন। তারা ঘরের কাজে হাত লাগাত, মেথরের কাজও শিখেছিল। গান্ধী মাইনে-করা চাকরদাসী রাখতেন না, নিজে সকল রকম শ্রমসাধ্য কাজ করতেন। তিনি মেটে ঘরে থাকতে ভাল বাসতেন। বারবার সারাভারত ভ্রমণ করেছিলেন, তাও রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরূপে। ট্রেনে বাড়তি পোশাক বা কাগজের বাণ্ডিল বালিশহিসেবে মাথায় দিতেন। বিছানা বলতে বোঝাত দেশী কম্বল আর মোটা খাদির চাদর। একবার তাঁর মনে হল মশারির ব্যবহার বাতিল করতে হবে। ফলে কিছুকাল শোবার আগে মুখে কেরোসিন তেল মেখে চাদর মুড়ি দিয়ে শুতেন। শুনেছিলেন গরীব চাষীরা তাই করে।

ব্রিটিশ শাসনকর্তারা ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দেবার জন্য সত্যি প্রস্তুত আছে কিনা জানবার জন্য গান্ধী বিলেত গিয়েছিলেন জাহাজের ডেকের যাত্রী হয়ে। তিনি তাঁর সেক্রেটারিদের ও সঙ্গীদের তোরঙ্গ-বোঝাই পোশাক নিতে মানা করে বিলেতে ধুতি, কুর্তা আর চপ্পল পরে, দেশী পোশাকে চলাফেরা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। যাত্রাকালে এক ভক্ত বন্ধু তাঁকে সাতশো টাকা দামের শাল উপহার দিয়েছিলেন। গান্ধী সেটা জাহাজেই সাত হাজার টাকায় বেচে দিয়ে বলেছিলেন, "গরীবের প্রতিনিধি এ ছাড়া আর কী করতে পারে।" তাঁর গুণগ্রাহীরা তাঁকে যত শাল উপহার দিয়েছিল তা দিয়ে একটা দোকান খোলা যেত।

গান্ধী ফরাসী দেশে পা দেবামাত্র কপনি পরা মানুষটিকে দেখে ফরাসীরা স্তম্ভিত হয়ে যায়। গান্ধী মৃদু হেসে তাদের বলেন, "তোমার দেশে তোমরা প্লাস্‌কোর্স (প্যাণ্ট) পর, আমি মাইনাস্‌কোর্স (কম বেশবাস) পছন্দ করি।" অত ঠাণ্ডা দেশে, অমন স্বল্পবেশ মানুষের দেশে গান্ধী ঐ স্বল্প পোশাকে ঘুরবেন কিনা, ইংলণ্ডেশ্বরের সঙ্গে দেখা করবেন কিনা, এ নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলতে থাকে। গান্ধী তাদের আশ্বস্ত

করে বলেছিলেন, "বাপু হে, রাজার গায়ে আমাদের দু'জনের পক্ষে যথেষ্ট হয় এমন পোশাক আছে।" গান্ধী গোলটেবিল বৈঠকে, অক্সফোর্ড কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বাকিংহাম রাজ প্রাসাদে, কপনি পরে, গায়ে তালিমারা শাল জড়িয়ে আর চপ্পল পায়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। বিলেতের জাঁদরেল মন্ত্রী চার্চিল সাহেব চটেমটে তাঁকে "ভারতের আধ-নাঙ্গা ফকির" বলে পরে উপহাস করেছিলেন। গান্ধী তাতে একটুও লজ্জিত কুণ্ঠিত না হয়ে তুষ্ট হয়েছিলেন। লণ্ডনে তাঁর রোজকার খাইখরচ বারো আনার বেশী হত না।

কোনও রকম অপচয় গান্ধীর সইত না। দিনরাতের চব্বিশ ঘণ্টা সময় তিনি নানাকাজের জন্য নিয়ম বেঁধে ভাগ করে রাখতেন। তিনি অত্যন্ত সময়নিষ্ঠ ছিলেন। কোনও কাজ মেটাতে তাঁর দেরি হয়ে যেত না অথচ খুব ব্যস্তসমস্তভাবে তাড়াহুড়ো করেও কিছু করতেন না। শব্দের অপচয়েও তাঁর আপত্তি ছিল। তিনি বহু বক্তৃতা দিয়েছিলেন, নানা লেখপ্রবন্ধ লিখেছিলেন কিন্তু সর্বদা বাড়তি অবান্তর কথার ব্যবহার এড়িয়ে চলতেন। তাঁকে লেখা যে সব চিঠির বা খামের একপিঠে কিছু লেখা থাকত না তিনি সে কাগজ জমা করতেন। তাদের মাপ অনুযায়ী সেগুলি বাণ্ডিল বাঁধা থাকত। তিনি সেগুলো চিঠির কাগজ হিসেবে কাজে লাগাতেন। তাঁর কয়েকটি মূল্যবান লেখ, বক্তব্য, লাট, রাজা, মন্ত্রীকে লেখা চিঠি ঐ কাগজে লেখা হয়েছিল। একটি শিশুর দেওয়া ক্ষুদে এক পেন্সিল আর বহু বছর সাবানের কাজে ব্যবহৃত একটি ঝামা যখন হারিয়েছিল তখন তিনি বেশ বিরক্ত হয়েছিলেন এবং অনেক খোঁজতল্লাস করে তাদের উদ্ধার করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর, দামী নামখোদাইকরা দপ্তরের কাগজে ব্যক্তিগত চিঠিপত্র লেখার অপরাধে গান্ধী মন্ত্রীদের আর বিধানসভার সদস্যদের ভৎর্সনা করেছিলেন। এভাবে ইংরেজদের কায়দাকেতা ও খরচের নকল করে আমরা আমাদের তথা ভারতের ক্ষতি ঘটাব একথাও জানিয়ে দিয়েছিলেন। রাজার জাত ইংরেজ

তাদের দীন প্রজাদের মনে সম্ভ্রমবোধ জাগাবার জন্য ওসব করত। আমাদের পক্ষে অর্থের অপচয় করা শোভন নয়। হাতে-তৈরী সাধারণ কাগজে উর্দু বা দেবনাগরীতে লেখা নামঠিকানাওলা কাগজ ব্যবহার করাই উচিত। কর্তাব্যক্তিদের দামী মানপত্র বা ফুলের তোড়া-মালা গ্রহণ করা অনুচিত।

দরিদ্রনারায়ণের জন্য সংগৃহীত অর্থের প্রতি পাইপয়সা বাঁচাবার জন্য গান্ধী ব্যগ্র ছিলেন। দশের টাকার কিছুমাত্র অপব্যয় করলে তিনি স্বেচ্ছাসেবক এবং কর্মীদের বকাবকি করতেন। জনসাধারণের জন্য সংগৃহীত তহবিলের মনিঅর্ডার বা চেক হাতবদল করার সময় খরচা বাঁচাবার চেষ্টা করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, "আমাদের জাতীয় আন্দোলনে ব্যয়বাহুল্যের কোনও ঠাঁই থাকা উচিত নয়। আমার জন্য বাছাই-করা কমলালেবু বা আঙুর আনা, অথবা ১২টা লাগলে ১২০টা আনা মানেই অপচয় ঘটানো। আমাদের মূক জনগণের প্রকৃত অছি হতে শিখতে হবে।" তাঁর ঢালা হুকুম ছিল, "হেঁটে যে পথ চলা যায় তার জন্য গাড়ী ব্যবহার করো না।" তাঁর যৌবনে তিনি এ বিধি পালন করতেন। সামান্য ক'টা টাকা বাঁচাবার জন্য আশ্রম থেকে একদিনে ৪২ মাইল পথ হেঁটে দোকান থেকে সওদা আনতেন। তাঁর দপ্তরে এবং আদালতে প্রতিদিন হেঁটেই যাতায়াত করতেন।

"দেশপ্রেমের তাগিদে জাতিবিদ্বেষ কি অপরিহার্য?" তাঁর এ বক্তৃতাটি শোনার জন্য টিকিটের ব্যবস্থা হয়েছিল। সংগৃহীত টাকা তিনি দেশবন্ধু স্মৃতিভাণ্ডারে দান করেছিলেন। "ঈশ্বর সত্যস্বরূপ" এই ভাষণটি তিনি গ্রামোফোনের রেকর্ডে তুলে নেবার অনুমতি দেন। তাঁর জীবনের এই প্রথম রেকর্ড করে আটঘণ্টায় তিনি যে ৬৫,০০০ টাকা পেয়েছিলেন তা হরিজন ভাণ্ডারে সঁপে দিয়েছিলেন।

গান্ধী শুধু টাকা বাঁচাতে পটু ছিলেন না, টাকা উপায় করতেও জানতেন। সরকার যখন তাঁর লেখা বই বাজেয়াপ্ত করত, তখন তিনি প্রকাশ্যভাবে তা ফেরি করতেন। এভাবে চার আনা দামের "হিন্দ

স্বরাজ” তিনি পাঁচ, দশ, পঞ্চাশ টাকায় বেচেছিলেন। দণ্ডীযাত্রাশেষে তিনি যে আধ-তোলা স্বভাবজ নুন সংগ্রহ করেছিলেন তা তাঁর এক ভক্ত ৫২৫ টাকায় কিনে নিয়েছিল। তখন আধতোলা সোনার দাম ছিল ৪০৲ টাকা। জগতে কোনও ব্যাপারী এমন চড়াদামে নুন বিক্রি করেনি।

লোকে তাঁর সই সংগ্রহ করার জন্য উৎসুক ছিল জেনে তিনি সই পিছু পাঁচ টাকা দক্ষিণে নিতেন। যে সব দানবীর তাঁকে হাজার হাজার টাকা চাঁদা দিত; তারাও ঐ মূল্য দিলে তবে তাঁর সই পেত। খাদির বিক্রি বাড়াবার জন্য গান্ধী দোকানদারও সেজেছিলেন। ডাইনে গজকাঠি ও বামে খাদির বোঝা রেখে তিনি খসখস করে রসিদ বানাতে থাকেন এবং ৫০ মিনিটে ৫০০ টাকার খাদি বিক্রি করেন। আর একবার, সফরকালে তিনি প্রতি স্টেশনে খাদি বেচেছিলেন। একবার খাদি প্রদর্শনী খোলার সময়ে তাঁর আবেদন শুনে ক্রেতারা এক হপ্তায় ৪০০০ টাকার খাদি কিনেছিল। সাধারণত সেখানে বছরে ৬০০০ টাকার বেশী খাদির কাটতি হত না। তাঁর বক্তৃতার যাদুতে একটি খাদি ভাণ্ডারের বার্ষিক বিক্রি বছরে ৪৮ টাকা থেকে ৬৫,৩১২ টাকায় পৌঁছেছিল। কংগ্রেস অধিবেশনের সময় গান্ধী সকল দর্শককে কুটির শিল্পের প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপনদাতা হতে অনুরোধ করতেন।

তাঁর বিদেশীবর্জন আন্দোলনের ফলে বাঙলায় বিদেশী কাপড়ের চাহিদা অর্ধেক হয়ে যায়। অন্যান্য প্রদেশও তার অনুকরণ করে ভারতে বিদেশী ব্যবসা প্রায় অচল করে দিয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে ভারতের নিত্য প্রয়োজন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার মাল রপ্তানি বাড়া দরকার এবং ভারতের পক্ষে হানিকর না হলেই বিলেতী ব্যবসায় সহায়তা করা সম্ভব। কেবলমাত্র পরনে খাদি ব্যবহার করে আশেপাশে বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার করার কোনও মূল্য ছিল না তাঁর চোখে কারণ এভাবে বিদেশী মাল আমদানি করে বড় বড় ব্যবসায়ীরা ব্রিটিশের সহযোগিতা করে স্বদেশের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। ধ্বংসপ্রায় সব

কুটিরশিল্পের উন্নয়ন করা ও সকল ভারতবাসীকে খাদিধারী করা তাঁর লক্ষ্য ছিল।

প্রতিকূল বিদেশী সরকারের কাছে তিনি কিছুই অর্থ সাহায্য পাননি, দেশের লোকের ঔদাসীন্যও ছিল প্রবল, তবু তিনি দেশের মানুষদের আত্মনির্ভরশীল করার জন্য, তাদের বুদ্ধি, কৌশল ও শ্রমে তৈরী খাদ্য, বস্ত্র ও নিত্যব্যবহার্য প্রয়োজনীয় জিনিস গড়ে তোলায় পটু করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘ ও নিখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ স্থাপিত হয় এবং দেশে সেগুলির নানা শাখা খোলা হয়। ওয়ার্ধার মগনবাড়ীতে কাতাই, বোনাই, কাগজ করা, সাবান তৈরী, চামড়ার কাজ, ছুতোরকামারের কাজ, ঘানিতে তেল পেষা ও ঢেঁকিতে চালকোটার ব্যবস্থার পত্তন হয়। যেমন ক্ষেতের শস্য থেকে ঘরে-তৈরী রুটির চেয়ে অন্য রুটি সস্তা হতে পারে না তেমনই নিজের হাতে-কাটা, হাতে-বোনা কাপড়ের চেয়ে অন্য কাপড় সস্তা হতে পারে না এটা তিনি বারবার বলতেন। তাঁর মতে জীবন কেবলমাত্র ধনের নিরিখ করার আধার নয়। বেকার থাকার ফলে মানুষের মনে যে আলস্যের জন্ম হয় তা তাঁকে পীড়া দিত। জাতির এই আত্মোন্নতির কথা স্মরণ রেখে তিনি তাঁর অর্থনীতি প্রচার করে বলেছিলেন, “তোমরা কি জান যে যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদন করা সত্ত্বেও আমরা বিদেশ থেকে গম আমদানি করি? আমরা খাদ্যপ্রাণহীন পালিশ-করা ধবধবে চাল খাই, কম পুষ্টিকর সাদা চিনি খাই। কলে-ভাঙা অপুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে রোগ ডেকে আনি। গ্রামের কলুদের আমরা বেকার করেছি। এখনকার গ্রামবাসী ৫০ বছর পূর্বের মানুষদের মতো বুদ্ধিদীপ্ত বা কুশলী নয়। সে অনবরত দিয়ে যাচ্ছে আর বদলে পাচ্ছে অতি কম। আমার পরিকল্পিত ব্যবস্থায় গ্রামে যা কিছু সুষ্ঠুভাবে এবং সামান্য যোগ্যতার সঙ্গে তৈরী হতে পারে এমন কোন জিনিসই শহরে গড়া হবে না।” গান্ধী লোকেদের চাল কুটতে, গম ভাঙতে, চিনির বদলে তাজা সরস গুড় খেতে এবং চরকা তাঁত চালাতে

বলেছিলেন। আশ্রমে-আসা পরদেশী অতিথিদের তিনি সোনালী গুড় পরখ করতে দিতেন।

খাদি যে কলের কাপড়ের প্রতিদ্বন্দ্বী এ কথা তিনি দেশবাসীকে ভুলে যেতে বলেছিলেন, "কলের মালিক সর্বদা কাপড় সস্তা করতে চাইবে, আমরা শ্রমিককে বাঁচার যোগ্য ন্যায্য রোজ দিতে চাইব। তা না হলে অজ্ঞাতসারে তাদের শোষণ করতে থাকব।" হাতে-করা কাগজের এক ব্যাপারী শ্রমিকদের দৈনিক ছ'পয়সা রোজ দিত। সে শীঘ্র কাগজ সস্তা দরে দেবার আশ্বাস দেয়। গান্ধী তাকে বলেছিলেন যে ঐ কম দামের কাগজ তিনি কিনতে রাজী নন।

চাষী ও গ্রাম্য কুটির শিল্পীদের শোষণ করে যে দালালরা জীবিকা অর্জন করে গান্ধী তাদের উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন। চাষীরা যে খরিদদারদের কাছ থেকে তাদের শ্রমের পূর্ণ মূল্য পায় না, জিনিসের দামের অল্প একটু অংশ পায় এবং নাবীদামের চেয়ে দালালের অত্যাচারই যে চাষীদের আসল সমস্যা এ তাঁর জানা ছিল।

গান্ধী কাপড় ও খাদ্যের র‍্যাশনের বিরোধী ছিলেন। কালোবাজারের মুনফাখোর ও অতিলোভী বেনেদের তিরস্কার করতেন। বলতেন যে, জোচ্চুরি করে ব্যবসায়ীরা টাকা সঞ্চয় করে আর ভাবে যে ধর্মকর্মে ও দানধ্যানে ব্যয় করলে সে পাপ ধুয়ে যাবে। ব্যাপারীদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "বড় বড় ব্যাপারীরা আর পুঁজিপতিরা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মুখে নালিশ জানাবে অথচ কাজে তাদের ইচ্ছামত চলবে, তাদের প্রসাদে বাণিজ্যে লাভ হয় তো শতকরা পাঁচভাগ, বাকী নব্বইভাগ যায় সরকারের গর্ভে।' ভারতীয় বণিকদের অসাধুতার জন্য স্বদেশী আন্দোলন সফল হতে পারেনি, তারা বিদেশী-মাল স্বদেশী বলে চালিয়েছিল। বণিকদের জন্য ভারত পরাধীন হয়েছে, আশাকরি দেশের পুনরুত্থানও তাদের সহযোগিতায় ঘটবে।"

কর্মঠ কিষাণ

কিষাণকে জগতের জনক বলা হয়েছে এমন একটি কবিতা গান্ধী পড়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল যে ঈশ্বর পালনকর্তা, চাষী তাঁর দক্ষিণ হাত। কবিতাটি তাঁর ভাল লেগেছিল। চাষীদের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা থেকে মুক্তিলাভের সঙ্গে ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা জড়িয়ে আছে এই বিশ্বাসবলে গান্ধী বলেছিলেন, "দেশে শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশী সংখ্যক চাষী। তারাই পৃথিবীকে রসময় করে রাখে, জমির আসল মালিক তারা, প্রবাসী জমিদাররা নয়। সব জমি তো গোপালের। আমরা যদি চাষীর শ্রমের সকল ফল কেড়ে আনি তাহলে স্বায়ত্ত-শাসনের কোনও অর্থই হয় না। উকিল ডাক্তার বা ধনী জমিদাররা দেশের সত্য মুক্তি আনতে পারবে না, চাষীদের মারফতই তা আসতে পারে।"

জমির খাজনার চাপ ছিল প্রবল। এক চৌথাই রাজস্ব চাষীদের কাছ থেকে আসত। কোথাও প্রাসাদোপম অট্টালিকা তৈরী হচ্ছে দেখলে বা শুনলে গান্ধী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন, "উঃ, এর সব টাকা জোগায় চাষীরা!" নাগরিক শ্রীবৃদ্ধির এমন সকল চিহ্নই তাঁকে চাষীদের খাজনার ভার, অন্যায্য আদায়ের পীড়ন, অপরিশোধ্য ঋণভার, নিরক্ষরতা এবং রোগব্যাধির কথা মনে করিয়ে দিত।

গান্ধী স্বভাব কিষাণ ছিলেন না কিন্তু তা হবার বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। বাল্যকাল থেকে তিনি ফল ফলাতে ভালবাসতেন। বিদ্যালয় থেকে ফিরে প্রতি বিকেলে তিনি বালতি বালতি জল ছাদে

বয়ে নিয়ে গিয়ে সখের বাগানে ঢালতেন। সকালে কুয়ো তলা থেকে স্নান সেরে ফেরার পথে পছন্দমত চারা এনে পুঁততেন। তিনি ৩৩ বছর বয়সে খামার বাড়ীতে থেকে চাষীর জীবন কাটাতে শুরু করেন। আশ্রম বাঁধার জন্য একটি ফলবাগিচাওলা জমি কিনে তিনি নিজ পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে সেখানে ঘর বেঁধে বসবাস করতে থাকেন। ধীরে ধীরে ভদ্রলোকের অর্থকরী পেশা এটর্নীগিরি ছেড়ে চাষীর কাজ রপ্ত করেন। তিনি জমি কোপাতেন, জল তুলতেন, ফলসব্জি ফলাতেন, কাঠ চেরাই করতেন। অচিরে সে জমিটিকে গান্ধী ফলভারে নত বাগানে পরিণত করেছিলেন। বিজ্ঞানসম্মত এবং অহিংসভাবে পালিত মৌমাছির চাষও তিনি জনপ্রিয় করেছিলেন। মধুপায়ী মৌমাছিরা পায়ে করে ফুলরেণু বয়ে নিয়ে যায় বলে ফলনের জাত ও মাপের উৎকর্ষ ঘটে জানতেন তাই ফলফসলের জমির কাছে মৌমাছি পালন করতে পরামর্শ দিতেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় দশ বছর চাষার কাজ করে গান্ধীর বেশ ভাল অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

জমির অনুর্বরতা, যন্ত্রপাতির অকুলান বা জলকষ্টের ওজর তিনি গ্রাহ্য করতেন না। তাঁর মতে চাষীর মূল সম্পদ হচ্ছে শ্রমশক্তির যথাযোগ্য সুব্যবহার। চাষীকে তৎপর, কুশলী আর আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। নয়ী তালিমের এক কর্মকর্তা নালিশ জানিয়ে বলেছিল যে তাদের ভাগের জমি চাষের অনুপযুক্ত। জবাবে গান্ধী বলেছিলেন, "দক্ষিণ আফ্রিকায় কী জমি নিয়ে আমরা ঘৃণিত ভারতীয়েরা চাষ আরম্ভ করেছিলুম তা তোমরা কল্পনা করতে পার না। তোমার পদে বহাল থাকলে আমি লাঙ্গল দিয়ে কাজ আরম্ভ করতুম না। কিশোর পড়ুয়াদের কোদালের ব্যবহার শেখাতুম। ওটা একটা কলাবিশেষ। কোদাল কোপাবার পর লাঙলবলদ কাজে লাগান যায়। পাতলা এক থাক পেঁকোমাটি অথবা মিশ্র সার ছড়িয়ে দিলে অনেক দরকারী সব্জি শাকপাতা ফলান যায়।"

ভারত ভাগ হবার আগে নোয়াখালির উৎপীড়িত হিন্দুরা আক্ষেপ

করে তাঁকে বলেছিল যে মুসলমান চাষীরা লাঙল বলদ দিচ্ছে না এমত অবস্থায় তারা কি খেয়ে থাকবে? গান্ধী চটপট বলে উঠেছিলেন, "কয়েকটা খোন্তাকোদাল জোগাড় করে জমি কোপাতে লেগে যাও। ওভাবে খোঁড়া জমিতে ফলন নেহাৎ কম হবে না।" ফলনের সঙ্গে আত্মনির্ভরতার অভ্যাস হবে এটা ছিল উহ্য।

গান্ধীর শেষ বন্দীদশার সময়ে বাঙলায় দুর্ভিক্ষে বহু প্রাণবলি হয়েছিল। সে বীভৎস দৃশ্যের কথা দেশবাসী ও সরকারী কর্মচারীদের মনে আঁকা ছিল। বছর পাঁচেক পরে আকালের আভাস পাবামাত্র বড়লাট তাঁর সেক্রেটারিকে বিমানযোগে সেবাগ্রামে পাঠিয়ে গান্ধীর পরামর্শ চেয়েছিলেন। একটুও বিচলিত না হয়ে গান্ধী বলেছিলেন, "আমাদের দেশে কত উর্বর জমি আছে, যথেষ্ট জল আছে, কর্মক্ষম বহু মানুষ আছে, এমন অবস্থায় খাদ্যের ঘাটতি ঘটবে কেন? জনসাধারণকে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। যে দু'দানা শস্য খাবে তাকে চার দানা ফলাতে হবে। প্রতি মানুষকে তার ব্যবহারের উপযোগী কিছু খাদ্য জন্মাতে হবে আর তা করার সহজ উপায় হচ্ছে কিছুটা সাফ মাটি জোগাড় করে তাতে জৈব সার মিশিয়ে (শুকনো গোবরও ভাল জৈব সার) টিনের বা মাটির পাত্রে রেখে তাতে কিছু সব্জির বীজ ছড়িয়ে দেওয়া। তারপর প্রতিদিন জলসেচ করতে হবে।··· উৎসবের খাইখেলাই বন্ধ রাখতে হবে, সব শস্যবীজের চালান বন্ধ করে দিতে হবে। গাজর, শালগম, আলু, চুবড়া আলু আর কলা থেকে শ্বেতসার পাওয়া যাবে। এসব খেয়ে এখনকার খাদ্যতালিকা থেকে শস্য ও ডালের ব্যবহার বাদ দিতে হবে; তাহলে ওগুলো সঞ্চয় করা সম্ভব হবে।" তাঁর পরামর্শমতো আত্মনির্ভর হতে গেলে কঠোর নিয়মনিষ্ঠা, ও কৃচ্ছ্র, নতুনধরনের খাদ্যে তৃপ্ত হবার ক্ষমতা আর পরদেশের কাছে খাদ্য ভিক্ষা না করার ব্রতপালনের দরকার হত। কাপড় ও খাদ্যের র‍্যাশনের কালে গান্ধীকে সরকারী দপ্তর থেকে কিছু নিতে হয়নি। তিনি ভাতডাল, রুটি না খেয়ে থাকতে পারতেন,

চিনি ব্যবহার করতেন না আর তাঁর খাদির কাপড় নিজে তৈরী করে নিতেন।

গান্ধী "হরিজন" পত্রিকায় কিভাবে সহজে হাতের কাছে বিনাখরচে যা পাওয়া যায়—গোবর, মলমূত্র, সব্‌জির খোসা, কচুরিপানা প্রভৃতি—দিয়ে মিশ্র সার করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর আশ্রমে মলমূত্র গর্তে জমিয়ে পুঁতে সার করা হত। এই মেথর-বনাম-চাষীর কাজ রক্ষণশাল গ্রামবাসী চাষীদের মনঃপূত হয়নি। গান্ধী রাসায়নিক সারের চেয়ে জৈব সার বেশী পছন্দ করতেন। জমির ফলন চটপট বাড়াবার জন্যে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে হিতে বিপরীত ঘটতে পারে এ শঙ্কা তাঁর মনে ছিল।

বলদে-টানা লাঙলের বদলে ট্রাক্টরের ব্যবহার করায় তাঁর উৎসাহ ছিল না। সবরমতী আশ্রমে তিনি নানারকম আধুনিক হলচালনা করা সত্ত্বেও বলদে-টানা লাঙলই পছন্দ করতেন। কারণ ঐভাবে চাষ করলে মাটির বাঁধুনি ঠিক থাকে অথচ ফসল ফলাবার উপযোগী গভীর কর্ষণ ঘটে। তাছাড়া একটা যন্ত্র দিয়ে বহুলোকের হাতের কাজ কেড়ে নেওয়ার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। দেশের বেকার হাতগুলোকে উৎপাদনের কাজে লাগাতে তিনি ব্যগ্র ছিলেন। যন্ত্রচালনার ফলে চাষীদের সৃজনীশক্তিতে ভাঁটা পড়বে এ ভয় তাঁর ছিল।

নানা শরিকের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করা খণ্ড জমিতে চাষ করার বিরোধিতা গান্ধী করেছিলেন। কারণ "একশো ঘর চাষী একযোগে চাষ করে আয় ভাগ করে নেওয়া, বৃহৎ জমিকে যেনতেন-প্রকারেণ একশোভাগ করে চাষ করার চেয়ে ভাল। প্রতি চাষীর হেলেবলদ ও গোযান রাখার পদ্ধতিও অনর্থক অপব্যয়মাত্র।" সমবায় প্রথায় চাষের ফলে সর্বসাধারণের একখণ্ড গোচরভূমি রাখা যায়, পশুদের যথাযথ চিকিৎসা করা যায়, সুস্থ সবল ষাঁড় পোষা যায়। একক গরীব চাষীর পক্ষে এসব কিছু করা সম্ভব নয়। পশুর খাদ্য জোগাতে গিয়ে বিপন্ন হয়ে সে অভাবের তাড়নায় বাছুর বেচে দেয়, নই বাছুর

মেরে ফেলে কিংবা অনাহারে মরার জন্য তাদের পথে ছেড়ে দেয়। পশুদের প্রতি অত্যাচার করে, নির্মমভাবে খাটায়।

গোরক্ষা ও গোপালনের ওপর গান্ধী জোর দিতেন। তাঁর মতে গোধন চাষীর পরম সম্পদ। ভারতের গ্রামে গ্রামে বারবার সফর করার সময়ে চাষীদের নিষ্প্রভচোখ আর গরুর করুণ অবস্থা দেখে বলতেন, "ভারতের মতো পৃথিবীর অন্য কোথাও গরুবাছুর এমন অবহেলিত নয়, অথচ আমরা গোমাতার পূজা করি। এখন গোসেবা কেবলমাত্র মুসলমানদের সঙ্গে গোহত্যা নিয়ে দাঙ্গা করায় আর গোমাতার পুণ্যস্পর্শে নিজেদের শুচি করায় দাঁড়িয়েছে। বহু গোশালা আর পিঁজরাপোল গোপীড়নের আস্তানাস্বরূপ।" পিঁজরাপোলগুলি অশক্ত দুধহীন গাইমহিষীর আশ্রয় করে তোলা পশুপালন সম্পর্কে পরামর্শদাতা হোক এই তার লক্ষ্য ছিল। খাদ্যগুণ বেশী আছে বলে তিনি মহিষীর দুধমাখনের চেয়ে গাভীর দুধমাখন ব্যবহার করার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। দেহান্তের পর গরুর হাড়চামড়া, নাড়িভুঁড়ি শিং কাজে লাগে এটাও ভুলতেন না।

তাঁর আশ্রমে তিনি পুষ্টসতেজ ষাঁড় পুষতেন, কম খরচে আদর্শ গোশালা চালু রেখেছিলেন। গোশালার খুঁটিনাটি খবর তাঁর জানা থাকত। প্রত্যেক নবজাত বাছুর তাঁর হাতের স্নেহস্পর্শ পেত। দুরারোগ্য রোগে পীড়িত একটি বাছুর বড় কষ্ট পাচ্ছিল, চিকিৎসক তা লাঘব করতে পারছিলেন না। গান্ধী তাকে ইনজেকসান দিয়ে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন এবং চিকিৎসক তার দেহে মারণ ওষুধ ফুঁড়ে দেবার সময়ে গান্ধী নিজে তার একটি পা ধরেছিলেন। অহিংসার এত বড় সাধকের দ্বারা এই হিংসাত্মক কাজ ঘটায় দেশে খুব হৈ চৈ পড়ে যায়। একজন জৈন গান্ধীর রক্ত দিয়ে এ পাপ ধোয়াবে এ ভয় দেখায়। গান্ধী শান্তচিত্তে এসব আঘাত অভিযোগ সয়ে নিয়েছিলেন।

দুষ্টু বাঁদরদের উৎপাত থেকে ফলফসল বাঁচাবার জন্য তিনি আর একবার প্রাণীবধের প্রস্তাব করে বলেছিলেন, "আমি নিজে চাষী হয়ে

গেছি সুতরাং যথাসাধ্য কম হিংস্রভাবে এদের উপদ্রব এড়াবার উপায় ঠাওরান আমার কর্তব্য। বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করলে বাঁদররা দাঁত খিঁচিয়ে চেঁচামেচি করে, একটুও ভয় পায় না। উপায়ান্তর না মিললে আমি এদের মারার কথা ভাবব।" বলাবাহুল্য আশ্রমে কোনও বাঁদর আহত বা নিহত হয়নি।

গরীব চাষীদের আয় বাড়ান গান্ধীর ধ্যানজ্ঞান ছিল। অনেকে বছরে চারমাস বেকার থাকে আর কেবলমাত্র চাষের আয়ে ভরণপোষণ চালাতে পারে না জেনে তিনি ত্রিশকোটি চাষীর বাধ্যতামূলক অলসতা দূর করার জন্য মেয়েদের চরকা চালাতে আর পুরুষদের তাঁত বুনতে বলেছিলেন। মূর্খ, আধনাঙ্গা, আধপেটা খেয়ে-থাকা চাষীদের কমপক্ষে এতটা আয় বাড়াতে চেয়েছিলেন যার ফলে তারা উপযুক্ত খাদ্য, স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী বেশবাস, বাসযোগ্য ঘর ও শিক্ষা পায়। তাদের মনে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার শক্তিও তিনি জাগাতে চেয়েছিলেন। কিষাণমজুর প্রজারাজ সমর্থন করে বলেছিলেন, "যখন চাষীরা তাদের দুঃখদুর্দশা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে বুঝতে শিখবে যে তাদের ভাগ্য এ অসহায় অবস্থার জন্য দায়ী নয়, তখন তারা ন্যায্যঅন্যায্য পন্থার বিচারের পরোয়া না করে অবিচারের বিহিত খুঁজবে। প্রকৃত স্বরাজ কি জানার পর আর কেউ তাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না।"

গান্ধীর নেতৃত্বে ভীরু চাষীরা সবিনয় আইনভঙ্গ এবং অসহযোগ আন্দোলনে ভাগ নিয়েছিল, খাজনা বন্ধ রেখেছিল, সরকারী জুলুম তুচ্ছ করে লবণ তৈরী করেছিল। প্রকাশ্য জনসভায় তারা স্বাধীনতার শপথ নিয়েছিল। এসব আন্দোলনে সামিল হবার ফলে তাদের জমিজমা বসতবাড়ী ক্রোকনিলেম হয়ে গিছল, তারা ধনের লোকসান সয়ে মনের বলে বলীয়ান হয়ে উঠেছিল।

:

নিঃস্ব নিলামকার

গান্ধীকে "মহাত্মা" নামে ডাকার এবং তাঁর পদস্পর্শ করার রীতি গান্ধী আইন করে দণ্ডনীয় করার পক্ষপাতী ছিলেন। তবু ভারতের গ্রামে-নগরে তাঁকে যুগাবতাররূপে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করার উচ্ছ্বাস তিনি রোধ করতে পারেননি। দেশের মানুষরা তাঁকে বন্ধু বলে চিনে নেবার পর তাঁকে আদর আপ্যায়ন করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত। নানা কাজের তাগিদে এই কাঙালের প্রতিনিধিটি দেশময় ঘুরতেন আর দেশের জনগণের সঙ্গে যোগ রাখতেন। সকল প্রদেশের লোকই চাইত যে গান্ধী তাদের ঘরে অতিথি হন, তাদের মধ্যে কিছুকাল বাস করুন। তাঁকে কিছু দিতে পারার জন্য বা তাঁর কাছ থেকে প্রসাদী চিহ্ন পাবার জন্য কেউ বা সোনার তকলি, রূপোর চরকা, অঙ্গের আভরণ উপহার দিত; চন্দন কাঠ বা হাতীরদাঁতের কারুকলাময় বাক্সে ভরে মানপত্র দিত, সুন্দর সুন্দর ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিত।

আধনাঙ্গা ফকিরের এসব কোনও কাজেই লাগত না। তাঁর মনে ভোগের ইচ্ছা ছিল না, সঞ্চয়ের সখ ছিল না। তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য এভাবে পয়সা নষ্ট করতে তিনি মানা করতেন কিন্তু অন্ধ ভক্তরা তাঁর কথা শুনত না। যে দেশে মাথাপিছু লোকের দৈনিক আয় মাত্র দু'এক আনা সেখানে মাত্র ক'ঘণ্টার মায়া রচনা করে এভাবে ফুলমালা, সভাসজ্জায় টাকার অপব্যয় গান্ধীর সইত না। ফুলের তোড়ামালা, সুশ্রী সুগঠন বাক্স নিয়ে তিনি কি করবেন? এসব তিনি

রাখবেন কোথায়! মাটির কুঁড়ে ঘরে, খদ্দরের পুটুলির মধ্যে সোনা রূপা রাখা মানে চোরকে নেমন্তন্ন করা। এই বৃথা অপচয়কে সঞ্চয়ে পরিণত করার তিনি এক উপায় ঠাওরালেন। ঐ সব দামী মনোহর বস্তু নিলেম করতে লেগে গেলেন। নিলেমের টাকা দরিদ্র নারায়ণের চাঁদার তহবিলে জমা করতে থাকলেন! কখনও তাঁর গলার ফুলের মালা হাতে নিয়ে সভায় হাজার হাজার লোকের সামনে চেঁচিয়ে বলে উঠতেন, "এ মালাটা কেউ কিনবে?" যদি কেউ বলত, "আমি পাঁচ টাকায় নেব" অমনই গান্ধী সুর চড়াতেন, "পাঁচ টাকা একবার, পাঁচ টাকা দুবার, দশ টাকা, বিশ টাকা দাম এ মালার, কেউ আরো বেশী দাম দেবে?" লোকের জেদ বেড়ে যেত, কেউ বা সে মালা ত্রিশ টাকায় কিনত, কেউ বা দিত তিনশো। আবার কখনও বা কাস্কেট হাতে নিয়ে গান্ধী বলতেন, "এটার দাম ২৫০৲ টাকা। না, না, ভুল বলেছি, এর দাম মাত্র ৭৫ টাকা।" ভিড়ের মধ্য থেকে অদেখা মানুষ অজানা গলায় বলত, "আমি ৩০০৲ টাকা দেব।" তবু ভরিত না চিত্ত, আরো বিত্তের লোভে গান্ধী হাঁক দিতেন, "তিনশো, তিনশো, আমি আরো বেশী দাম চাই। এর আগে আমি হাজার টাকায় কাস্কেট বেচেছি।"

অতি সত্য কথা। কলকাতাবাসীরা তাঁকে তিনবার দামী সুছাঁদ বাক্সে-ভরে মানপত্র দিয়েছিল, তিনবারই তিনি সেগুলো চড়াদামে বেচে দিয়েছিলেন। কেবলমাত্র বড় বড় শহরে বা রাজধানীর সভায় তাঁর নিলেমের দর চড়ত না, অতি নগণ্য গণ্ডগ্রামেও তিনি গলার মালার বিনিময়ে ৫০ টাকা আর মানপত্র বিকিয়ে ৩০০ টাকা পেয়েছিলেন। যে সভায় দেড় হাজার টাকা চাঁদা উঠত, নিলেম শেষে সেখানেই তহবিলে পাঁচহাজার টাকা জমা হত। গান্ধী এ প্রথা চালু করার পর ইদানীং এর বহু নকল ঘটেছে।

পরম স্নেহভরে ধনমন উজাড় করে দেশের মানুষ তাঁকে যে ফলফুল উপহার দিত সেগুলো গ্রহণ না করে বিকিয়ে দিলে তাদের মনে আঘাত

লাগতে পারে বুঝে গান্ধী বলেছিলেন, "তোমরা ভুলেও ভেব না যে তোমাদের দেওয়া উপহার এভাবে বিকিয়ে দিয়ে আমি তোমাদের ভালোবাসার অমর্যাদা ঘটাচ্ছি। আমি এসব বয়ে নিয়ে বেড়াতে পারিনে। আমার বাক্সপেঁটরা নেই, আশ্রমে এসব রাখার সিন্দুক নেই।···তাছাড়া এভাবে নিলেম করায় কী দোষ? নিলেমের ডাক মানুষের মনে সুস্থ সহজ প্রতিযোগিতার ছোঁওয়া লাগায়, মহৎ কাজে দানের জন্যে স্ত্রীপুরুষের মনে দাক্ষিণ্য জাগিয়ে তোলে। কেবলমাত্র আমাকে খুশী করার জন্যই লোকে নিলেমে আজগুবি দর দেয় না।" তিনি নিলেম ডেকে আশানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করতে পারেননি এমন ঘটনা অতি বিরল।

ভিতপাথর গাঁথার পর তাঁর ব্যবহৃত কর্ণিক কড়াই একদা আড়াই হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছিল। একটি খাদি সুতোর মালার দাম মিলেছিল দুশো টাকা। ধনীর দেওয়া এক স্বর্ণ তকলির মূল্য উঠেছিল পাঁচ হাজার। তাঁর হাতে সঁপে দেওয়া একটি প্রসাদী লেবুর বিনিময়ে তিনি দশটাকা পেয়েছিলেন। তাঁর ভিক্ষের ঝুলিতে জমে ওঠা গহনা বা আংটিও তিনি চড়াদামে বিক্রি করতেন। একটা আংটি তিনবার হাত-ফেরতা হয়ে ৪৫০ টাকায় বিকিয়েছিল, তার আসল দাম ছিল ত্রিশ টাকা। নিলেমকালে গান্ধী একটি ছোট ছেলের প্রতি হাত বাড়িয়ে দেন। তার মা তাকে তুলে ধরামাত্র তার গলার সোনার পদক খুলে নিয়ে তিনি নিলেম করে দেন।

নানা কাজে-ভরা লম্বা সফরের কষ্টক্লান্তিতেও তাঁর মনের হাল্কা-হাসির উৎস শুকিয়ে যেত না, জন্মজাত বেনেমি ঘুচত না। ৭৮ বছর বয়সে, হিন্দুমুশলিম দাঙ্গাহাঙ্গামার সময়ে তিনি আর্ত বিহারী মুসলমানদের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করেছিলেন। তখনও সংগৃহীত সকল গহনা এবং সোনার আংটি নিলেম করেছিলেন।

একবার তাঁর ভিক্ষের ঝুলিতে একটি কাণাকড়ি পাওয়া গিছল। গান্ধী সরলমনের দরদভরা সে দান পেয়ে মহাখুশী হয়ে বলেছিলেন,

"গরীব মানুষটি হয় তো তার শেষ সম্বল সঁপে দিয়েছে। এ হচ্ছে ত্যাগব্রতীর দেওয়া শ্রেষ্ঠভিক্ষা। আমার কাছে সোনাদানার চেয়ে এই মহাদানের মূল্য অনেক বেশী। ও মাপের সোনার কড়ির চেয়েও সে কাণাকড়ি মূল্যবান প্রমাণ হয়েছিল। একজন ১১১ টাকায় কড়িটা কিনে নিয়ে সেই অদ্ভুত দানের চিহ্ন নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল। গান্ধী নিজে ছিলেন ভিখারী, আপনার ধন বলতে তাঁর কিছু ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরেজ-জার্মানীর অসম চুক্তির বিরোধিতা করে যে সভা হয়েছিল তার তবিলে তিনি একটি তামার পয়সা চাঁদা দিয়েছিলেন। সেটি এক ভক্ত পাঁচশো টাকায় কিনে নিয়েছিলেন।

নির্ভীক ভিক্ষু

ধীরে ধীরে গান্ধী দশের কাজে এত জড়িয়ে পড়েছিলেন যে নিজের পরি-বার পরিজন বা পেশার প্রতি বিশেষ নজর দিতে পারতেন না। ক্রমশঃ তাঁর মনে এই ধারণা জন্মাল যে দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের সত্যকার সেবক হতে গেলে সকল সখ-সুখ, আরাম-ঐশ্বর্য্য ছাড়তে হবে, স্বেচ্ছায় খুশীমনে দারিদ্র্যব্রত নিতে হবে। একে একে সকল সঞ্চয় ত্যাগের চেষ্টার ফলে তাঁর জীবনে এমন দিন এল যখন যে কোন রকম সঞ্চয় সংগ্রহ তাঁর বিচারে অপরাধ বলে মনে হতে লাগল আর তা থেকে মুক্তি পেলে পরম তৃপ্তি পেতে থাকলেন। তিনি তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির দাবি ছাড়লেন, তাঁর জীবনবীমার টাকা বাজেয়াপ্ত হতে দিলেন এবং মাসে চারহাজারী আয়ওলা আইনী কাজ করা বন্ধ করলেন। দানপত্র লিখে তাঁর এবং স্ত্রীর সোনাজহরত দশের হিতে সঁপে দিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে ফিনিক্স বসতির জন্য ৬৫০০০ টাকা ব্যয় করেছিলেন তাও দান করে দিলেন। নিজে সর্বহারা হয়েছিলেন, স্ত্রীপুত্রদেরও রিক্ত নিঃসম্বল করেছিলেন।

বন্ধুদের দাক্ষিণ্যের মুখাপেক্ষী হয়ে তাঁর জীবনের শেষ চল্লিশ বছর কেটেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার টলস্টয় বাড়ীর সংসার খরচ চালাতেন কলেনবাক্ নামে এক জার্মান বন্ধুকর্মী। ভারতের আশ্রম চলত চাঁদার সাহায্যে।

পণ্ডিত মালব্যকে ভিক্ষুদের যুবরাজ বলা হত। গান্ধী ছিলেন ভিক্ষু-মহারাজ। দশের সেবায় ভিক্ষা করার ব্যাপারে তিনি একক ছিলেন।

চেয়ে-মেগে তিনি যা কিছু জড় করতেন সব দরিদ্রনারায়ণের সেবায় সঁপে দিতেন। তাঁর এ বৃত্তির বিকাশ ঘটেছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখানে তিনি প্রথম চাঁদা তোলার মহড়া দিয়েছিলেন। নাতাল ভারতীয় কংগ্রেসের সভ্যদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের ভার ছিল তাঁর ওপর। এক সন্ধ্যায় এক ধনী সভ্যের কাছে আশী টাকা পাবার আশায় গিছলেন কিন্তু নানাভাবে অনুনয় করা সত্ত্বেও সভ্যটি চল্লিশ টাকার বেশী দিতে রাজী হলেন না। গান্ধীও নাছোড়বান্দা, তাঁর ক্ষিদে পেয়েছিল, ক্লান্ত লাগছিল তবু সারারাত জেগে ধর্ণা দিয়ে, ভোরে পুরো চাঁদা আদায় করে তিনি ঘরে ফিরেছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়রা যখন বিরাট সত্যাগ্রহী দল নিয়ে পদযাত্রা চালিয়েছিল তখন পাঁচ হাজার সত্যাগ্রহী ও তাদের পরিবার-বর্গের ভরণপোষণের দায় ছিল গান্ধীর। প্রতিদিন তিন হাজার টাকার ওপর খরচা হত। তাঁর এক চিঠি মারফত গান্ধী ভারতে আবেদন জানাবার ফলে ভারতের রাজা, নবাব, ধনী বণিকরা হাজার হাজার টাকা পাঠিয়েছিল, কংগ্রেস অধিবেশনে হাতের আংটি বালা খুলে দিয়েছিল, টাকার স্তূপ জমা হয়েছিল।

গান্ধী চাঁদার টাকার পাই পয়সা নষ্ট হতে দিতেন না, পুরো হিসেব রাখতেন। দাতারা যে বিশেষ কাজের জন্য টাকা দিত তা অন্যকাজে লাগাতেন না। তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারের টাকা কিভাবে খরচ হচ্ছে জনসাধারণ তা জানতে চাইবামাত্র তিনি পরীক্ষিত হিসেব দাখিল করেছিলেন। লোকমান্য তিলকের স্মরণার্থে গান্ধী তিন মাসে এক কোটি টাকা সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন। এক সহকর্মী নিবেদন করেছিল যে যদি গান্ধী দশমিনিটের জন্য দর্শক হন তো নামজাদা পেশাদার নট-নটীরা একরাতে ৫০০০০ টাকা দান করবে। গান্ধী তা করতে রাজী না হওয়া সত্ত্বেও তহবিলে এক কোটি পনের লাখ টাকা জমা হয়েছিল। গান্ধী প্রায়ই বলতেন, "ধনীর হাজার টাকার দান মূল্যবান, দরিদ্রের তামার পয়সা বা একটি রূপোর টাকা আরো মূল্যবান। সচেতনভাবে কষ্ট

করে দেওয়া পাই পয়সা স্বরাজ প্রতিষ্ঠায় দাতার দৃঢ়সঙ্কল্পের পরিচয় দেয়।" কত চাষী, কত দুঃখী বুড়োবুড়ী সারাদিন গাঁয়ের ধুলোকাদার পথে চলে, দূর দূরান্তর থেকে এসে ছেঁড়া কাপড়ের বাঁধন খুলে সযত্নে জমা-করা তামার পয়সা গান্ধীকে ভিক্ষা দিত। গান্ধী সে দৃশ্য কখনও ভোলেননি।

তিলক স্বরাজ ভাণ্ডার ছাড়া, গান্ধী দেশবন্ধুর নামে চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার জন্য, গোখলে, লাজপৎ রায়, অ্যাণ্ডরুজ, কিশোরী ভ্যালিয়াম্মা ও জালিয়ানওয়ালাবাগের শহীদদের স্মৃতিরক্ষার জন্য চাঁদা তুলেছিলেন। তিনি প্রকাশ্য জনসভায় জানিয়েছিলেন যে নির্দিষ্টকালের মধ্যে জালিয়ানওয়ালাবাগে স্মরণার্থে প্রয়োজনীয় অর্থ না সংগৃহীত হলে তিনি নিজ আশ্রম বিক্রি করে যথাসর্বস্ব সঁপে দেবেন। বাঙলায় দু'মাস থেকে তিনি দেশবন্ধু স্মৃতিনিধিতে দশ লাখ টাকা জমা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধবয়সে শান্তিনিকেতনের জন্য ভারতের নগরে শহরে ঘুরে নিজে অভিনয় করে চাঁদা তুলছেন শোনামাত্র গান্ধী প্রথম কিস্তিতে ৫০০০০ টাকা সংগ্রহ করে পাঠিয়ে কবিকে এভাবে কষ্ট করতে ও শক্তিক্ষয় করতে বারণ করেছিলেন।

ভারতে যখনই দুর্ভিক্ষ হয়েছে, ভূকম্প ঘটেছে, বন্যার জলে মানুষের ঘর, ফসল ভেসে গেছে, তখনই এই মহাভিক্ষু তাঁর ভিক্ষাঞ্জলি মেলে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। খাদি প্রচারের জন্য এবং অচ্ছুত হরিজনদের বিকাশের জন্য তিনি কন্যাকুমারিকা থেকে পাঞ্জাব আর কচ্ছ থেকে আসাম পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। ব্রহ্মদেশ ও সিংহলেও গিছলেন। হরিজন তহবিলে তিনি দু'কোটি টাকা জমা করেছিলেন। ভিক্ষুভোজনের জন্য টাকা দিলে তিনি তা গ্রহণ করতেন না। তাঁর মতে মানুষের আসল প্রয়োজন একমুঠো অন্ন নয়, আত্মমর্যাদাপূর্ণ ভব্যজীবন। তাই বলেছিলেন, "আমি নাঙ্গাকে অপ্রয়োজনীয় কাপড় না দিয়ে অতি প্রয়োজনীয় কাজ দিতে চাই। তাদের আমি উদ্বৃত্ত রুটির টুকরো বা রদ্দি কাপড় দিতে চাই না।"

একদা জেলের এক ডাক্তার তাঁকে জিগেস করেছিল, "গান্ধীজী কর্মক্ষমদের কি ভিক্ষা করা উচিত? আইনত আপনি এ অব্যবস্থা রদ করতে রাজী আছেন কি?" গান্ধী চটপট বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই, তবে আমার মতো মানুষরা যাতে অবাধে ভিক্ষা করতে পারে তার সুবাবস্থা রাখব।" 'ভিক্ষার চাল কাঁড়া কি আকাঁড়া' এ প্রবাদ উল্টে দিয়ে এ ভিক্ষুটি নিজের পছন্দমত ঢঙে ভিক্ষা নিতেন, দাবি জানাতেন। গান্ধীর বুলি, ভিক্ষা নেবার ঢঙ, সর্ত ছিল নিজস্ব, অনন্যসাধারণ। রেলের প্ল্যাটফরম্, গাড়ীর পাদানীতে বা খোলা মোটরে দাঁড়িয়ে তিনি দর্শকদের সামনে ভিক্ষাপাত্র মেলে ধরতেন। তাঁকে ভিক্ষা দেবার জন্য হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি লেগে যেত। তাদের সামান্য সঞ্চয় গান্ধীকে দেবার জন্য শত শত গ্রামবাসী, বালকবৃদ্ধ, অবলারা বহু পথ আসত। কেউ বা ক্ষেতের কুমড়ো, বেগুন, ফল-ফসল ভেট দিত। একটি আদর্শ আবাসিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা তাঁকে একবোঝা হাতে-কাটা সুতো, হাতে-বোনা খদ্দরের টুকরো উপহার দিয়েছিল। তারা কয়েকদিন ঘি, দুধ, গম না খেয়ে কিছু টাকাও দিয়েছিল। একটি বিধবা একদা সঙ্গিনীর কাছ থেকে দু'আনা ধার নিয়ে গান্ধীর হাতে দিল দেখে সঙ্গিনী জিগেস করেছিল, "মাত্র দু'আনা কেন দিলেন?" তিনি উত্তর করেছিলেন, "আমি ওঁর দানের তবিলের অঙ্ক বাড়াবার জন্য চাঁদা দিইনি, সর্বত্যাগী মহাত্মাকে ভিক্ষা দেবার সাধ মিটিয়েছি।"

দু'দশ লাখ টাকা সংগ্রহ করা গান্ধীর পক্ষে ছেলেখেলার সামিল ছিল। তিনি মাইক্, তার ও পত্রিকা মারফত আবেদন জানাতেন। এক সাংবাদিকের টুপি খুলে নিয়ে ভিক্ষাপাত্র বানিয়ে তিনি সেটি তার সামনে মেলে ধরেন। এই আজব ভিক্ষাপাত্রে বিমূঢ় সাংবাদিককে প্রথম ভিক্ষা দিতে হয়েছিল।

ব্রহ্মদেশে ভিক্ষা করতে গিয়ে গান্ধী বলেছিলেন, "চোদ্দ বছর পরে আমি ব্রহ্মদেশে এসেছি। চোদ্দ বছর অন্তর দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেও

তোমরা সাহসের সঙ্গে যুঝে থাক। আশা করি তোমরা দরিদ্রনারায়ণের এই প্রতিনিধিকে—যে আর এদেশে নাও আসতে পারে তাকে—নিরাশ না করে মুক্তহস্তে দান করবে।" বণিকদের দেওয়া অল্প পরিমাণ চাঁদার ফর্দ দেখে ব্যঙ্গোক্তি করে বলেছিলেন, "এ তালিকা ছিঁড়ে ফেলে মোটা দানের অঙ্ক বসাও। আমি নিজে গুজরাতী বেনে, বেনেদের থলি থেকে বড় দান চাই।" এই ভর্ৎসনার ফলে সেখানে তখনই দ্বিগুণ চাঁদা জমা হয়।

সিংহলে গিয়ে গান্ধী বললেন, "যখন মহেন্দ্র সিংহলে এসেছিলেন তখন বৃহত্তর মাতৃভূমি ভারতে মনের, ধনের বা আর্থিক সম্পদের অভাব ছিল না, তখন আমাদের সুদিন ছিল, তোমরাও সে গৌরবের ভাগী হয়েছিলে। আজ ভারতমাতার সন্তানেরা অন্নহীন, আমি তাদের তরফ থেকে ভিক্ষা নিতে এসেছি। যদি তোমরা তাদের সঙ্গে আত্মীয়তাবন্ধন অস্বীকার না কর তো কেবলমাত্র টাকা না দিয়ে রত্ন-অলঙ্কারও দেবে।" কচ্ছীরা তাদের দান শুধু আপন প্রদেশবাসীর সেবায় লাগাতে চায় শুনে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, "যদি তোমরা আমায় পূর্ণ বিশ্বাসে চাঁদা দাও তো জেনে রেখো সে টাকা কখন কিভাবে সদ্ব্যয় করতে হবে তা আমার জানা আছে।" বড় বেদনায় তিনি বলতেন, "হনুমানের মতো আমার বুক চিরে দেখাবার শক্তি নেই, যদি তা থাকত তো তোমরা দেখতে পেতে যে সেখানে রাম-ভক্তি ছাড়া কিছু নেই। সেই রামকে আমি ভারতের কোটি কোটি দরিদ্রের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি।" বৃদ্ধবয়সেও চাঁদা তোলার জন্য গান্ধী একদিনে বারোটা সভায় বক্তৃতা দিতেন, সভায় কখনও বা বলতেন, "আমাকে এক আনা, আধআনা, আধলা, পাই, যা পার দাও। কৈ, টাকার তোড়া কৈ?" কচিৎ কিছু ভিক্ষা না পেলে একা ধর্ণা দিয়ে বসে থাকতে চাইতেন। এভাবে তিনি লোকেদের দান দিতে শেখাতেন। এ ভিক্ষুকে ঘরবাড়ী, টাকাকড়ি, গহনা, খাদি প্রভৃতি উপহার দেবার জন্য কখনও কখনও দাতারা মাঝরাত পর্যন্ত স্টেশনে বা সভায় বসে থাকত। তাঁর ৭৮তম জন্মদিনে গান্ধী ৭৮ লাখ গুণ্ডী চরকার সুতো উপহার পেয়েছিলেন।

তাঁর ভিক্ষাভাণ্ডারে একটি কাণা কড়ি পাওয়া গিছল। গান্ধীর চোখে শ্রেষ্ঠভিক্ষার এই চিহ্নটি সোনাদানার চেয়ে মূল্যবান ছিল। ফাঁসির এক আসামী মরার আগে তার কাছে যে একশো টাকা ছিল তা দেশসেবার কাজে গান্ধীকে দেবার আবেদন করেছিল।

অধিকাংশ সভা ভঙ্গ হবার পর টাকার বোঝা বইবার জন্য এবং টাকা গোনার জন্য তিনচারজন কর্মী লাগত। একবার চাঁদা তোলার পর একটি কর্মী গান্ধীর সামনে এসে তার দু'টি হাত মেলে ধরেছিল। তার দুই হাতে তামার কলঙ্কের দাগ লেগে গিছল। কাঙাল দাতারা বহুদিন সঞ্চিত মাটিতে পুতে রাখা তামার পয়সা, পাই দান করেছিল। ব্যাপারটা কি বুঝে গান্ধী বলেছিলেন, "এ হচ্ছে মহাদান। আমাদের পক্ষে এ দানগ্রহণ পুণ্যব্রত, ওদের পক্ষে এটা হতাশাভরা আঁধার জীবনে আশার আলোস্বরূপ। ওদের জীবনেও সুদিন আসবে, দেশের দুঃখীর অভাব ঘুচবে, এই আশায় ওরা ভিক্ষা দিচ্ছে।"

গান্ধী পেশাদার ভিক্ষার বিরোধী ছিলেন। আত্মসম্মান খুইয়ে ভিখিরীরা যেভাবে দু'মুঠো অন্ন জোগাড় করে তা দেখে তাঁর মনে বিতৃষ্ণা জন্মাত। কাজ না দিয়ে অলসতার প্রশ্রয় দিয়ে ভিক্ষা দেওয়ার রীতির তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। ভারতের পঞ্চাশ লাখের বেশী সাধুর দলকেও তিনি পছন্দ করতেন না। পঙ্গু ছাড়া কেউ সমাজের হিতকারী কাজ না করে, শ্রম না করে, পরনির্ভর হোক এ তিনি চাইতেন না। সবল নিকর্মা মানুষের ভিক্ষাগ্রহণ তিনি চুরির সামিল মনে করতেন।

বিহারে ভূকম্পের পর ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের এবং শিবিরের শরণার্থীদের ভরণপোষণ ও আশ্রয় লাভের পরিবর্তস্বরূপ কাজ করতে পরামর্শ দিতেন। নতুবা তাদের মনে দশের দানে বাঁচার হীনবৃত্তি জাগবে এ শঙ্কা তাঁর ছিল। তাদের বলেছিলেন, "সৎ ভাবে কাজ কর, আমি ভিখারী চাই না। যে কোনও কাজের ভার নিয়ে তা নিষ্ঠাভরে করে যাও। কাজ কর, কাজ কর, ভিক্ষা চেও না।"

লোভী লুঠেরা

ভিক্ষু মহারাজ গান্ধী লুঠেরা-সর্দার ছিলেন। দেশের ধনীর ধন বাড়ছে আর গরীব আরো দুঃখী হচ্ছে দেখে তিনি তাঁর নিজ মতে সাম্য-বাদ প্রচার করতে চেয়েছিলেন। গাঁয়ের মানুষের দুঃখ ঘোচাবার জন্য গ্রাম্যজীবনের হেরফের ঘটাতে চেয়েছিলেন। রঘু ডাকাত যেমন ধনীর ধনরত্ন লুঠ করে গরীবদের বিলিয়ে দিত, গান্ধীও তাই করতে ব্যগ্র ছিলেন তবে তাঁর কাজের ধারা ছিল ভিন্ন। তিনি মশাল জেলে সড়কিবল্লম নিয়ে রাজার ঘরে হানা দিতেন না বা কালীসাধনা করতেন না।

তিনি ছিলেন দেশমাতার পূজারী। তাঁর দুঃখী দেশকে তিনি সবল সুন্দর স্বাবলম্বী করতে চেয়েছিলেন। বুঝিয়ে সমঝিয়ে, ভালবাসার দাবি জানিয়ে ধনীকে বলতেন তোমার ধন দাও, ব্রাহ্মণপণ্ডিত-জ্ঞানীকে বলতেন তোমার বিদ্যা দাও, মালিককে বলতেন তোমার পুঁজি থেকে শ্রমিককে তার শ্রমের ন্যায্য মূল্য দাও, রাজাকে বলতেন প্রজাকে সুবিচার দাও, কর্মীকে বলতেন তোমার সেবা দাও। নিপীড়িত অসহায় মানুষকে বলতেন তোমার অলসতা, পরনির্ভরতা ও ভয় ত্যাগ কর। এই সর্বত্যাগী বৈরাগীর কথার যাদুতে, সাধনার গুণে এবং অন্তরের টানে ছেলেমেয়ে, যুবাবৃদ্ধ সবাই বাঁধা পড়ত।

গান্ধী যখন কোনও গ্রামে বা শহরে গিয়ে আপন দাবি জানাতেন তখন বাপমা তাঁর হাতে সন্তান সঁপে দিত, বৌঝিরা গায়ের গহনা খুলে দিত, মহাজন শেঠেরা হাজার হাজার টাকা ভেট দিত। তিনি

তাঁর দলবল নিয়ে দিগ্বিজয় করেছিলেন। দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ের মতো বয়ে গিয়ে অলস ভীরু প্রাণকে জাগিয়ে দিয়ে দুষ্টের দমন করার জন্য এগিয়ে আসতে ডাক দিয়েছিলেন। দুরাচারী রাজশক্তির কাছ থেকে শাসনভার ছিনিয়ে নিতে বলেছিলেন।

বিহারে চম্পারণ জেলায় সাহেব মালিকরা জবরদস্তি করে বেগার খাটিয়ে চাষীদের দিয়ে নীলচাষ করাত, খুব পীড়ন করত। তাদের লাখ টাকা মুনফা হত আর চাষীরা বিনা মজুরিতে খেটে মরত। চম্পারণের মানুষ গান্ধীর কাছে গিয়ে বিহিত চেয়ে ধর্ণা দিল। তিনি চম্পারণে গিয়ে তদন্ত করে প্রজার পক্ষ নিয়ে লড়তে লেগে গেলেন। রাজার লোক পাইক পাঠিয়ে তাঁকে বন্দী করল। আদালতে বিচার আরম্ভ হল। চাষীরা পুলিসের রাঙা চোখ ও লাঠির মার তুচ্ছ করে তাদের মুশকিল-আসান গান্ধী মহারাজকে দেখবার জন্য দোর ভেঙে আদালতে ঢুকে পড়েছিল। অনেক বাদবিতণ্ডার পর গান্ধী নীলকরের লুঠ লোপ করেন, শতাধিক বছরের পুরানো নীলচাষের তিনকাঠিয়া বিধি নাকচ করেন। চম্পারণ থেকে নীলের কলঙ্ক মুছে যায়।

একবার দেশে অজন্মা হয়। ভাল ফসল হয়নি তবু রাজা খাজনা মাপ করে না। প্রজার বড় বিপদ, পেটে খেতে না পেয়ে পেয়াদার হুমকি শুনতে হয়, খাজনা জোগাবার জন্য হালবলদ বেচার কথা ভাবতে হয়। গান্ধী তাদের পরামর্শ দিলেন যে রাজা যতই জুলুম করুক না কেন তারা যেন খাজনা না দেয়। চাষীরা সেই জিদ ধরে বসে রইল। সরকার তখন আবাদী জমি আটক করল। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চাষীরা যে ফসল ফলিয়েছিল তা তাদের ঘরে উঠল না। গান্ধী তাদের আইন অমান্য করে একটা বাজেয়াপ্ত পেঁয়াজ ক্ষেত থেকে পেঁয়াজ লুঠ করে আনতে পরামর্শ দিলেন। তাঁর কথামতো

যে একদল লোক চলে গেল, মোহনলাল ছিল তাদের সর্দার। পেঁয়াজ লুঠ হল সঙ্গে সঙ্গে মোহনলাল আটক হল। তার মুক্তির পর গ্রামশুদ্ধ মানুষ সভা করে তাকে স্বাগত জানাল। লুঠেরা গান্ধী সভাপতি হয়ে তাকে জয়তিলক পরিয়ে দিলেন। তার হিম্মতের তারিফ করে তার সাথীরা তাঁর নাম দিল "পেঁয়াজ চোর"।

আরো একবার দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রামে গ্রামে সরকারী দুঃশাসন অচল করার জন্য গান্ধী তাদের বললেন, "রাজকোষ পূর্ণ করা হবে না। দীন প্রজার টাকা শুষে নিয়ে রাজার এত প্রভাবপ্রতাপ, নামমান, অথচ প্রজাকে ন্যায্য অধিকার সুখসুবিধা দেবার বেলায় এত কৃপণতা, এত তঞ্চকতা! খাজনা বন্ধ কর।" রদ হল খাজনা দেওয়া। সরকার প্রতিশোধ নিল। প্রজাদের ভিটেমাটি, বাসনপত্র ক্রোক হয়ে গেল। কাতারে কাতারে প্রজা কাঁথাকম্বল লোটালাঠি সম্বল করে বাপঠাকুর্দার ভিটে ছেড়ে ভিন্প্রান্তে চলে গেল। সরকারী কর্মচারীরা সে সব ঘরজমি বিক্রি করতে চাইল, কিন্তু কেনার লোক মিলল না। দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের পর রাজা প্রজার সর্ত মেনে নিয়ে সন্ধি করল। সে বছর গরীবদের খাজনা মকুব হয়ে গেল।

দেশে মাথাপিছু গড়পড়তা মাসিক দু'টাকা আয়ের তুলনায় নুনের কর ছিল চড়া। নুনভাত খেয়ে থাকে যে দীনহীনজন তাকেও নুনকর দিতে হত। দেশময় কত নোনাখাড়ি, পাহাড় তবু কারো নুন বানাবার হুকুম মিলত না, আইনের বারণ ছিল। গান্ধী লবণ আইন ভাঙার মহা আন্দোলন শুরু করলেন। দেশময় সাড়া পড়ে গেল। তিনি নিজে সবরমতী আশ্রম থেকে পদযাত্রা করে ২৫ দিনে ২৪১ মাইল পথ চলে দণ্ডীর সাগরতটে পৌঁছে বেআইনীভাবে নুন করে লবণ আইন ভঙ্গ করলেন। সরোজিনী নাইডু তিলকমালা পরিয়ে এই আইনভাঙা নেতাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। গান্ধী বলেছিলেন, "একমুঠো নুনমাটি তুলে নেওয়া শিশুর খেলার সামিল, আমি সমস্ত নুন আটক করতে চাই।" ভারত জুড়ে বহু মানুষ

বেআইনী নুন জমা করতে লেগে গিছল। পুলিস ক্ষেপে উঠে জোর তল্লাসী শুরু করল, গান্ধী যাত্রী পর্দানশীন মেয়েদের পুঁটলিবাক্স নেড়ে দেখতে লাগল। গাড়ী করে যেতে যেতে গান্ধী একজন পাহারা-দারকে শুধোলেন, "আমার কাছে চোরাই নুন আছে, আমাকে গ্রেপ্তার করবে কি ?"

গান্ধী ধারাসানার সরকারী নুনগোলা লুঠ করবেন স্থির করেছেন জেনে সরকার তাঁকে কয়েদ করে। তাঁর যে অহিংস লুঠেরা-বাহিনী নুন গোলায় হানা দিতে গিছল পুলিস তাদের ইস্পাত বাঁধানো লাঠির ঘায়ে ঘায়েল করে। তাদের হাড় ভেঙে, মাথা ফেটে রক্তগঙ্গা বইতে থাকে। ভারতের অন্যান্য প্রান্তে বহু নুনগোলা লুঠ হয়েছিল। একবছরের মধ্যে লবণ আইনের কড়াকড়ি ঢিলে হয়। গাঁয়ের আশপাশের খাড়িমাটি থেকে প্রাকৃতিক নুন সংগ্রহ করে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করা বা গাঁয়ের মধ্যে বিক্রি করা আইনত গ্রাহ্য হয়।

গান্ধী চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে ছাড়তেন না। ইংরেজরা প্রথমে ভারতে ব্যবসা করতে এসেছিল, তারপর 'পোহালে শর্বরী বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে'। তারা রাজা হয়ে ভারতের বহুপুরানো জগদ্বিখ্যাত তাঁতশিল্প নাশ করে দিল। বিলেতের কলে-বোনা কাপড় আমদানি করে, বেচাকেনা করে, অনেক টাকা লুঠে নিতে লাগল। গ্রামে গ্রামে কাটুনীর চরকা বন্ধ হল, তাঁতীর তাঁত অচল হল। সোনার দেশে দুর্ভিক্ষ ও দুর্দশায় মানুষ নাজেহাল হতে থাকল। গান্ধী দেশবাসীদের, দুর্গত তাঁতীকাটুনীদের বিদেশী বণিকের এই ফন্দির কথা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। তাদের আবার স্বদেশী সুতোয় স্বদেশী কাপড় 'খদ্দর' তৈরি করে ব্যবহার করতে পরামর্শ দিলেন।; বিদেশী কাপড় বর্জন করতে বললেন। দেবী চৌধুরাণীর মতো মেয়ে-ফৌজ জড় করলেন। মেয়েপুরুষ বাহিনীর সাহায্যে বিদেশী পণ্যের আড়তে ও মদের দোকানে ধর্ণা দেওয়াতে

লাগলেন। দেশবাসীর মন থেকে চিকনমিহি বিলেতী কাপড়ের মোহ নষ্ট করার জন্য দেশময় ঘুরে, শহরে-নগরে-গ্রামে, চৌমাথায়-চত্বরে-ময়দানে, পরদেশী কাপড়ের বোঝায় আগুন জ্বালিয়ে ছারখার করতে থাকলেন। তাঁর এই বিদেশী বর্জনের আন্দোলনের ফলে বিলেতী কাপড়ের আমদানি কমে গিছল, বহু বিলেতী কাপড়কল অচল হয়ে গিছল। হাজার হাজার লোক বেকার হয়েও পড়েছিল। কয়েকবছর পরে গান্ধী বিলেত গিয়ে ল্যাঙ্কাসায়ারের মিলমহলে শ্রমিকদের বলেছিলেন, "এখানে লোকের বেকার সমস্যা দেখে আমি ব্যথিত হয়েছি। তোমাদের এখানে ৩০ লাখ লোকের কাজ গেছে আর আমাদের দেশে ৩০ কোটি লোক বছরে ছ'মাস বেকার বসে থাকে। প্রতিমাসে তোমাদের বেকাররা মাথাপিছু ৪০ টাকা ভাতা পায়, আমাদের দেশে প্রতি কর্মীর মাসিক আয় হচ্ছে পাঁচ টাকা। তোমরা কি ভারতীয় তাঁতীকাটুনী ও তাদের ক্ষুধার্ত সন্তানদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে সমৃদ্ধশালী হতে চাও ? শিল্পে পটু হওয়া সত্ত্বেও ভারত কি ল্যাঙ্কাসায়ারের তৈরী কাপড় কিনতে বাধ্য ?" তাঁর এই জোরাল মনখোলা আবেদন শুনে মিল শ্রমিকদের মন টলে গিছল, তারা তাঁকে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে স্বাগত জানিয়েছিল।

নিজের দেশেও ধনীদরিদ্রের বিষম তফাত ঘোচাবার জন্য তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। ডাক্তার-মোক্তার-চাকুরে ও পুঁজিপতিদের তিনি গরীবের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গিয়ে গরীবানাচালে চলতে বলেছিলেন। মেথরদের এক সভায়, সভাপতির স্ত্রী হাত থেকে একজোড়া সোনার বালা খুলে গান্ধীকে সঁপে দিয়ে বলেছিলেন, "আপনার আদর্শ মেনে চলার ফলে আজকাল স্বামীরা বেশী উপার্জন করে না, সঞ্চয় করে না এবং স্ত্রীদের বেশী গহনা দিতে পারে না। আমার এই বালাজোড়া ছাড়া অন্য গহনা নেই। এই শেষ সম্বলটুকু আপনার হরিজনসেবার কাজে নিবেদন করে দিলুম।" গান্ধী এ কথা শুনে কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়ে জবাব দিয়েছিলেন, "আমার

কথামতো কাজ করে অনেক ডাক্তার-মোক্তার-ব্যবসাদার গরীব হয়ে গেছে সত্য। কিন্তু তার জন্য আমার কোনও আক্ষেপ নেই। এই দুঃখী দেশে, যেখানে দিনে এক পয়সা ভিক্ষা পাবার জন্য কাঙাল মানুষরা ক্রোশের পর ক্রোশ পথ চলে সেখানে কারো গায়ে গহনা শোভা পায় না।"

তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে কত স্ত্রীলোক অঙ্গের আভরণ হরিজন ভাণ্ডারে দান করেছিল। এভাবে মেয়েদের মন ভুলিয়ে গহনা নিতেন বলে অনেকে গান্ধীর নিন্দা করত। গান্ধী তাতে একটুও না ঘাবড়ে বলেছিলেন, "আমার সভায় যে সব হাজার হাজার মেয়ে আসে তারা দশের সেবায় তাদের যথাসাধ্য গহনা দান করুক এই আমার মিনতি।" কৌমুদী নামে এক কিশোরী এক জনসভায় মঞ্চের ওপর উঠে এসে একে একে তার সোনার কণ্ঠমালা, কাঁকন ও কর্ণভূষণ খুলে দিয়েছিল। আর এক বালবিধবা সত্যবতী গান্ধীকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে তার সব গহনা দান করেছিল। সে সব সম্পদ গান্ধী দরিদ্রদের স্বাবলম্বী করার কাজে ব্যবহার করেছিলেন। স্ত্রীলোকের গহনা লুঠে তাঁর শান্তি হত না, তাদের দিয়ে এই প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিতেন যে তারা দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আর গহনা পরবে না।

গান্ধী শিশুদেরও রেহাই দিতেন না। একটি ছোট্ট মেয়ে তাঁকে ফুল দিতে এসেছিল। গান্ধী তাকে শুধোলেন: "তোমার হাতের আংটিটা আমাকে দেবে কি?" সে তখনই আংটি খুলে দিয়েছিল। তার মা-বাবার মত নিয়ে গান্ধী সেটা নিয়েছিলেন। আর এক ডাক্তারের ছোট ছেলের জামা থেকে সোনার বোতাম খুলে নিয়ে বলেছিলেন, "এবার লক্ষ্মীছেলের মতো আমাকে প্রণাম করে চলে যাও। আমার এখন রক্তের চাপ অতিমাত্রায় বেড়েছে জান কি?" অভিভাবকদের অমতে গান্ধী কোনও শিশুনাবালকের গহনা নিতেন না।

এই মহাত্মা ডাকাতটিকে লোকে আদর করে ঘরে ঘরে ডেকে নিয়ে নজরানা দিত, কাছে গেলে ধন্য বোধ করত। এক ধনী ভক্ত গান্ধীকে

বলেছিল যে উনি তার বাড়ীতে যতক্ষণ থাকবেন তার প্রতি মিনিটে সে ১১৬ টাকা নজরানা দেবে। কাজের মানুষ গান্ধী সময় অভাবে মাত্র দু'মিনিট থাকতে পেরেছিলেন। বহু ধনী ভক্ত গান্ধীকে বারবার লাখ লাখ টাকা দিয়েছিল।

অজস্র দান পেয়েও গান্ধীর প্রয়োজন মিটত না। তিনি অসুস্থ জেনে একটি পরিচিত ডাক্তার তাঁকে দেখতে আসায় গান্ধী বললেন, "আমার সময়ের অনেক দাম। আমাকে পরীক্ষা করার জন্য যে সময় দেব, তার কি মূল্য দেবে?" চিকিৎসক তাঁর পকেটে যা ছিল বের করে দিয়ে বললেন, "মহাত্মাজী এর আগে রুগী দেখে এই দক্ষিণা পেয়েছি, আর পাই পয়সাও কাছে নেই।" তিনি দক্ষিণা তো পেলেন না, উল্টে ডাকাত রুগীর হাতে নিজের পুঁজি তুলে দিলেন। মহাত্মার আহ্বানে মতিলাল নেহরু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মাসিক হাজার হাজার টাকার উপার্জন ত্যাগ করে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের সখের বিরাট বসতবাড়ী দেশের নামে সঁপে দিয়েছিলেন। গান্ধী যে কত জানা অজানা মানুষের বিষয় সম্পদ গহনা টাকা লুঠে নিয়েছিলেন, কত আমিরকে ফকির করেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই।

কর্মপ্রিয় কয়েদী

দেশবাসীর পরাধীনতা ঘোচাবার উদ্দেশ্যে, তাদের বিদ্রোহী করে তুলে, অহিংস অসহযোগ প্রচার করে, রাজার সঙ্গে বাদবিবাদ ঘটিয়ে সরকারী শাসন অচল করার অপরাধে গান্ধীকে বহুবার কয়েদ ভোগ করতে হয়েছিল। বন্দী অবস্থায় নিজ দোষ স্বীকার করে তিনি কঠিনতম সাজা চেয়ে নিতেন। সাধারণতঃ দাগী আসামীদের প্রাপ্য সাজা, জেলবাসের লজ্জা ও শঙ্কা গান্ধী ভারতবাসীর মন থেকে ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন।

তিনি সবশুদ্ধ এগারবার কয়েদভোগ করেছিলেন। একদা চারদিনের মধ্যে তিনবার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। জেলভোগের পুরো মেয়াদ চালু থাকলে তাঁকে এগার বছর উনিশদিন বন্দী থাকতে হত কিন্তু কর্তারা মাঝে মাঝে সাজা মাপ করে দিয়েছিল বলে তিনি মোট ছ'বছর দশমাস আটক ছিলেন, আটত্রিশ বছর বয়সে তিনি প্রথম বন্দী হন, যখন তিনি শেষবার জেল থেকে বেরিয়ে আসেন তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধী সর্বপ্রথম মাত্র পাঁচটি সত্যাগ্রহীসহ বন্দী হন। কয়েদখানা সম্বন্ধে তিনি নানা ভয়াবহ কাহিনী শুনেছিলেন বলে প্রথমে একটু ঘাবড়ে গিছলেন। সাথীহারা হয়ে একা বন্দী থাকবেন কিনা, রাজবন্দী হিসেবে বিশেষ ব্যবহার পাবেন কিনা, এই সব ভেবে উন্মনা হয়ে পড়েছিলেন। যে আদালতে তিনি বহুবার এটর্নীরূপে দাঁড়িয়ে সওয়ালজবাব চালিয়েছিলেন সেখানকার কাঠগড়ায় বন্দীরূপে

দাঁড়াবার সময় তাঁর একটু অস্বস্তিবোধ ঘটেছিল। তাঁর দু'মাসের কারাদণ্ড হবার পর আদালতের বাইরে অপেক্ষমান জনতাকে এড়িয়ে তাঁকে লুকিয়ে একটা ঘোড়াগাড়ীতে ঢুকিয়ে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। জেলে পৌঁছে এই নামী ব্যারিস্টারটিকে আঙুলের ছাপ দিতে হয়েছিল। তাঁর ওজন মেপে, সম্পূর্ণ নাঙ্গা করে কয়েদীর নোংরা পোশাক পরতে দেওয়া হয়েছিল। দু'চার দিন অন্তর বহু সহকর্মী বন্দী হতে থাকে। পক্ষকাল মধ্যে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫০; মাত্র ৫০ জনের বাসোপযোগী একটি ঘরে তাদের ঠেসে রাখা হত। জনাকতক কয়েদীকে রাতে তাঁবুতে নিয়ে রাখা হত।

জেল পরিদর্শক, অধ্যক্ষ বা প্রধান পাহারাদার প্রতিদিন চার পাঁচবার রোঁদে আসত। তখন গান্ধী ও তাঁর সহকর্মীদের টুপি খুলে হাতে নিয়ে সার বেঁধে দাঁড়াতে হত।

সেখানকার বরাদ্দ খাদ্য ভারতীয়দের পক্ষে অযোগ্য ছিল। সকাল সন্ধ্যা তাদের মিলিপ্যাপ (এক জাতীয় মকার জাউ) খেতে দিত, তার সঙ্গে ঘি-দুধ-চিনি থাকত না বলে তারা তা খেতে পারত না। কোন কোন দিন সন্ধ্যায় শুধু বরবটি সেদ্ধ খেতে দিত। নুন ছাড়া কোনও মশলা মিলত না। ইয়োরোপীয় কয়েদীরা মাংস, রুটি ও সবজি পেত। সেই সবজির খোসার সঙ্গে অন্য তরকারি সেদ্ধ করে কালাকয়েদীদের খেতে দিত। গান্ধী একশো ভারতীয় কয়েদীর স্বাক্ষরসহ এক প্রতিবাদপত্র জেলের কর্তাকে পাঠান। জবাবে তাঁকে বলা হয়েছিল, "এটা ভারত নয়, এখানকার জেলে কোনও স্বাদু খাদ্য পরিবেশন করা হয় না।" পক্ষকাল মধ্যে, গান্ধীর চেষ্টায়, ভারতীয়দের জন্য কিছু চাল, রুটি, সবজি ও ঘি বরাদ্দ হয়। তাদের নিজেদের রান্না করার হুকুমও মেলে। গান্ধী রান্নায় সাহায্য করতেন এবং দিনে তিনবার পরিবেশন করতেন। আরো বেশী পরিমাণ বা ভাল খাদ্যের দাবি না করে গান্ধীভাইয়ের সহকারীরা নির্বিবাদে চিনিবিহীন আধসেদ্ধ জাউ খেয়ে নিত। তৃতীয়বার কয়েদকালে খাওয়া নিয়ে গান্ধীর ঝঞ্ঝাট বাধেনি। তিনি তখন শুধু ফলাহার

করতেন, যথেষ্ট কলা, টম্যাটো আর মেওয়ার সরবরাহ পেতেন। তিনি স্বেচ্ছায় শ্রম করতে চেয়েছিলেন, সে দাবি মঞ্জুর হয়নি।

জেলের কিছু কিছু কানুন গান্ধীর পছন্দ হয়ে গিছল। মুক্ত হবার পর তিনি চা পান করার অভ্যাস ছেড়ে দেন, সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে রাতের খাওয়া খেয়ে নেওয়ার রেওয়াজ চালু রাখেন।

এর পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় আর দু'দফা জেলবাসের সময় গান্ধী বহু কষ্ট ভোগ করেছিলেন। তাঁর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। যে আদালতে দশবছর আইনজীবী হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন সেখানে তাঁকে হাতকড়া লাগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাঁর পরনে তখন ওদেশী কয়েদীর পোশাক ছিল। মাথায় ছোট জঙ্গীটুপি, গায়ে আসামীর নম্বর-আঁকা তীরমার্কা ঝোলা কুর্তা ও প্যাণ্ট, পায়ে পাঁশুটে রঙের পশমী মোজা ও চামড়ার জুতো ছিল। বৃষ্টির ঝাপটে ভিজে, তাঁকে আপন বিছানা মাথায় নিয়ে পৌনে একমাইল পথ হাঁটতে হয়েছিল। জেলে তাঁকে নিগ্রো ও চীনে কয়েদীদের সঙ্গে আটক রাখা হয়েছিল। কয়েকটি জুলু কয়েদী তাঁকে গাল দিয়েছিল, মেরেও ছিল। সেখানে পাইখানায় আব্রু ছিল না। তাদের ভাষা না বুঝলেও ঐ কয়েদীদের অভব্য অশ্লীল আচরণে গান্ধী সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিলেন, অল্পকাল পরে তাঁকে দুহাত চওড়া আর তিনহাত লম্বা এক কুঠুরিতে একা বাস করতে দেওয়া হয়। সে ঘরে ছাদের কাছে একটি ছোট জানলা ছিল। বন্ধ দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁকে খাবার খেতে হত। দিনে তাঁকে দু'বার বাইরে নিয়ে চলাফেরা করিয়ে আনত। একদা ভাতের সঙ্গে ঘি দিত না বলে গান্ধী দেড়মাস অন্নগ্রহণ করেননি, দিনে মাত্র একবার ভুট্টার জাউ খেয়ে থাকতেন। এ প্রতিবাদের ফলে তাঁকে পাঁউরুটি ও ঘি দেওয়া হয়েছিল। বিছানা হিসেবে একটা ছোবড়ার তোশক, দুটো কম্বল, আর কাঠের বালিশ পেয়েছিলেন। প্রতিদিন এক বালতি জল পেতেন, শৌচাদি করার জন্যও একটা বালতি থাকত। কয়েদীদের ওপর নজর রাখার জন্য সন্ধ্যার পর ঘরে যে বিজলিবাতি জ্বলত তা এত কমজোর ছিল যে

গান্ধী সে-আলোয় দু-একখানা যা বই পেয়েছিলেন তা পড়তে পারতেন না। যদি বা কখনও ঘরে পায়চারি করতেন তো পাহারাদার হুকুম করত, "অত চলাফেরা করো না, আমার ঘরের মেঝে ক্ষয়ে যাবে।" ঘরের মেঝে তো ছিল জমাট আলকাতরার তৈরী!

স্নানের জন্য অনুমতি চাইলে পাহারাদার বলত পোশাক খুলে যেতে। পঞ্চাশ কদম পথ তিনি উলঙ্গ অবস্থায় যেতে পারবেন না বলায় স্নানঘরের পর্দায় পোশাক ঝুলিয়ে স্নান করার হুকুম তাঁর মিলেছিল। ভালমত গা, মাথা ধুতে না ধুতে হাঁক পড়ত, "স্যাম বেরিয়ে এস।" চটপট বেরিয়ে না এলে নিগ্রো এসে লাথি মেরে বের করে দিত।

সাজা হিসেবে তাঁকে দৈনিক ন' ঘণ্টা সার্টের পকেট কাটতে হত, ছেঁড়া কম্বলের টুকরো জুড়তে হত, লোহার দরজা বা মেঝে ঘষে সাফ করতে হত। ঘণ্টা তিনেক ঘষার পরও সে দোরের বা মেঝের চেহারা একটুও বদলাত না। তিনি একদা পাইখানা সাফ করার ভারও পেয়েছিলেন। এসব কষ্ট উপদ্রব গান্ধী হাসিমুখে সহ্য করতেন কিন্তু তাঁর সাথীদের সঙ্গে থাকাকালে তাদের দুঃখ দেখে গান্ধীর মন বিচলিত হয়ে পড়েছিল। তারা শ্রমে কাতর হয়ে কাঁদত, কেউ বা অজ্ঞান হয়ে যেত। তাঁর ডাক শুনে তারা ঘরের আরামবিলাস ছেড়ে এভাবে দুঃখ লজ্জা সইতে এগিয়ে এসেছিল। এই আত্মদহন ও আত্মত্যাগের ফলে তাদের দাসত্ব মোচন হবে এই বিশ্বাসের জোরে গান্ধী মন শান্ত-শক্ত রাখতেন।

ভোর ছ'টায় সবাইকে শৌচাদি সেরে নিতে হত। সাতটা থেকে কাজ শুরু হত। সঙ্গীদের সঙ্গে গান্ধী দেড়মাইল পথ চলে গিয়ে ন'ঘণ্টা শক্ত পাথুরে জমি কোপাতেন। অত শ্রমের ফলে তাঁর ওজন কমে গিছল, মেরুদণ্ড পিঠ ব্যথা করত। দু'হাতের ফোস্কা গলে রস পড়ত। অতিকষ্টে গান্ধী কোদাল চালাতেন, একটু বিশ্রাম নিলেই হুকুম হত, "কাজ কর, কাজ কর।" গান্ধী পাহারাদারদের বলেছিলেন যে এরকম

জুলুম করলে কাজ বন্ধ করে দেবেন। এ শাসানি শুনে সে নরম সুরে কথা কইত। সসম্মানে নির্দিষ্ট কাজ শেষ করতে পারার জন্য গান্ধী ভগবানের কাছে শক্তি ভিক্ষা করতেন।

ভারতে গান্ধী যখন "রাজাধিরাজের অন্নসত্রে" থাকতেন তখন তাঁর সব খরচ সরকার বহন করত তবু তাঁর ভরণপোষণের জন্য কোনও অপচয় তাঁর সইত না। তাঁর ব্যবহারযোগ্য সামান্য বাসন ও একটা লোহার খাট রেখে গান্ধী একবার সব বাড়তি আসবাব ও তৈজসপত্র ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কয়েদখানার বন্দীদের সমস্ত খরচ যে তাঁর মূকমূর্খ গরীব দেশবাসী জোগায় একথা গান্ধী কখনও ভুলতেন না। আগা খাঁ প্রাসাদে, তাঁর শেষ বন্দীদশাকালে তিনি বলেছিলেন, "এভাবে এক বিরাট প্রাসাদে প্রহরীবেষ্টিত হয়ে থাকা আমি জনসাধারণের টাকার অপব্যয় মনে করি। দেশে যখন এত লোক অনাহারে প্রাণ হারাচ্ছে তখন এ ব্যবস্থা মনুষ্যত্ববোধের বিরোধী।"

ভারতে গান্ধীর প্রথম বিচার এক স্মরণীয় ঘটনা। ইংরেজ জজসাহেব আসামীকে অভিবাদন জানিয়ে আসনে বসেছিলেন। বিদ্রোহসূচক কার্যকলাপের জন্য গান্ধীকে ছ'বছর বিনাশ্রমের কারাদণ্ডের রায় দিয়ে জজ বলেছিলেন, "আপনার সঙ্গে যাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মিল নেই তারাও আপনার উচ্চ আদর্শ এবং মহান সাধুচরিত্রকে শ্রদ্ধা করে।" গান্ধী জবাবে বলেছিলেন, "ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট জনপ্রিয় দেশসেবক এই আইন অনুসারে দণ্ড ভোগ করেছেন। এভাবে দণ্ডিত হয়ে আমি গৌরব বোধ করছি। আমি জানি আমি আগুন নিয়ে খেলা করেছি, মুক্ত হয়ে আমি পুনরায় তাই করব।" সাজার হুকুম জারি হবার পর গান্ধী কাঠগড়া ছেড়ে যাবার সময় সারা আদালতের মানুষ দাঁড়িয়ে উঠেছিল। পুলিসের তারে গুপ্তভাষায় তাঁকে 'বম্বের ৫০ নম্বর রাজনীতিক, বলে খবরাখবর পাঠান হত। ব্যারিস্টারদের খাতা থেকে তাঁর নাম কাটা গিয়েছিল।

ভারতের জেলেও ঢোকামাত্র গান্ধীর উচ্চতা এবং দেহের বিশিষ্ট

চিহ্নাদি লিখে নেওয়া হয়েছিল। একা একটি ঘরে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাঁর অঙ্গে কপনি ছাড়া দ্বিতীয় বস্ত্র ছিল না তবু তাঁর দেহ তল্লাশ করা হত এবং কম্বল নাড়াচাড়া করা হত। গান্ধী এ জুলুম নীরবে মেনে নিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর জলের কুঁজো বুটজুতো দিয়ে ছোঁবামাত্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কখনও কখনও বিধি-নিষেধের জালায় উত্যক্ত হয়ে তিনি আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি থাকা সত্বেও দেখা করতেন না বা পত্রালাপ বন্ধ রাখতেন।

বন্দী অবস্থায় গান্ধী তিক্ত হয়ে পড়তেন না। প্রতিবার জেল থেকে মুক্ত হবার পর তাঁর মন আরো শান্ত স্থির ও ঋদ্ধিশীল হয়ে উঠত। তাঁর কাছে জেল ছিল বিশ্রামের ঠাঁই, কারণ সেখানে আরো নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে নিত্যকর্ম করা যায়, ভাল ভাল বই পড়ে সঙ্গীর অভাব মেটানো যায়। গান্ধী বই পড়তে ভালবাসলেও মুক্ত অবস্থায় তাঁর এত কাজ ও দায়িত্ব জড় হত যে পড়ার জন্য যথেষ্ট অবকাশ মিলত না। তিনি রুটিন বেঁধে বই পড়তেন। তিনি জেলে উর্দু শিখেছিলেন; সংস্কৃত, তামিল, হিন্দী, গুজরাতী এবং ইংরেজীতে লেখা বহু বই পড়েছিলেন। একবার বন্দীজীবনে তিনি দু'বছরে ধর্ম, সাহিত্য ও সমাজবাদ সম্বন্ধে বিখ্যাত লেখকদের ১৫০ খানা বই পড়েছিলেন। গীতা, কোরাণ, বাইবেল, বৌদ্ধ, শিখ ও পার্শীধর্মগ্রন্থ এবং রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ মনুস্মৃতি ও পাতঞ্জলী যোগদর্শনও পড়েছিলেন। তিনি ৬৫ বছর বয়সে এক সহবাসী কর্মীর কাছ থেকে জেলে জ্যোতির্বিদ্যায় প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন। জেলের কর্তাদের কাছ থেকে একটা দূরবীক্ষণ যন্ত্র আদায় করে গ্রহতারা চিনতে শিখেছিলেন।

গান্ধী জেলেও নিয়মিত প্রার্থনা করতেন, চারছয় ঘণ্টা সুতো কাটতেন আর জোর কদমে হাঁটতেন। আগা খাঁ প্রসাদে ৭৫ বছর বয়সে তিনি কস্তুরবা ও নাতনাকে ভূগোল, জ্যামিতি, ইতিহাস, গুজরাতী ব্যাকরণ ও সাহিত্য পড়াতেন। 'দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ' আর শিশুদের জন্য বালপুঁথি তিনি জেলে লিখেছিলেন।

উপনিষদ এবং ভারতীয় সন্ত কবিদের গাথা থেকে যে ইংরেজী তর্জমা তিনি জেলে করেছিলেন তা 'বন্দীশালার গান' নামে ছাপা হয়েছিল।

জেল থেকে তিনি আশ্রমবাসী, সহকর্মী, জেলের কর্তাদের, লাট-বড়লাটদের এবং বিলেতে প্রধান মন্ত্রীদের বহু পত্র লিখেছিলেন। প্রতি হপ্তায় তিনি আশ্রমের শিশুদের পত্র দিতেন। কখনও লিখতেন, "তোমরা যদি বিনাপাখায় উড়তে শেখো তাহলে তোমাদের কোনও কষ্টই থাকবে না। আমার পাখা নেই তবু আমি মনে মনে রোজ তোমাদের কাছে উড়ে যাই। ঐ তো দেখি ছোট বিমলাকে আর হরিকে।" জেলবাসের নিয়মনিষ্ঠার তারিফ করে তিনি আদর্শ কয়েদীর চালচলন কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে লিখেছিলেন। আত্মসম্মান হানিকর নয় এমন সকল কাজই কয়েদীদের করা উচিত বলে তিনি বিধান দিয়েছিলেন। নোংরা খাবার খেতে বাধ্য না করলে অথবা অপমান না করলে কয়েদীদের অনশন ধর্মঘট চালাতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি বা তাঁর অনুচরেরা গুঁড়ি মেরে বসে ওপরওয়ালাদের 'সরকার সেলাম' বলে অভিবাদন জানাননি।

স্বরাজলাভের পর ভারতে কয়েদখানা চালু রাখতে হবে তা তিনি জানতেন তবে সেগুলিকে কারিগরি কাজের কারখানা এবং চরিত্র শোধ-রাবার ঠাঁই করে তুলতে চেয়েছিলেন। যারা সাময়িকভাবে জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে বিপথে চলেছে কয়েদখানাকে তাদের শিক্ষালয়ে পরিণত করায় তিনি আগ্রহশীল ছিলেন। বন্দীরা কিভাবে হাতের কাজ করে তাদের ভরণপোষণের খরচ মিটিয়ে নিতে পারে তার ফিরিস্তি বন্দী অবস্থায় লিখে তিনি পেশ করেছিলেন কিন্তু কর্তারা একজন কয়েদীর ভাবধারা নিয়ে কাজ করতে রাজী হননি।

মাঝে মাঝে এই ভাল কয়েদীটি বড় ঝঞ্ঝাট বাধাতেন, কর্তাদের বিপন্ন করতেন। তাঁকে পাঁউরুটি খেতে দেবামাত্র তিনি ছুরি চাইলেন। কাটা সেঁকা রুটি ছাড়া কাঁচা রুটি তিনি খেতেন না। হাঁটার জন্য বেশী জায়গা চাইতেন। সহকর্মী বন্দীদের চিকিৎসা করতে চাইতেন।

কার হাঁপানি আছে, কার প্রাকৃতিক চিকিৎসার দরকার, কে আয়ুর্বেদী ওষুধপালা খাবে সে সবের দায় নিজে নিতে চাইতেন। লম্বা লম্বা উপোস করেও কর্তাদের ও সরকারকে ঘাবড়ে দিতেন। তাঁর অবস্থা মন্দ হলেই সরকার তাঁকে মুক্ত করে দিত। তারা তাঁর মতো নামী মানুষের দামী প্রাণ নিয়ে খেলা করতে ভয় পেত। জেলে তাঁর অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ ধরা পড়ামাত্র তারা তৎপর হয়ে পরম যত্নে অস্ত্রোপচার ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেছিল। গান্ধী জেলে দু'বার অসুস্থ হয়েছিলেন।

তিনি প্রায়ই আত্মীয়পরিজন নিয়ে জেলে ঢুকতেন। আগা খাঁ প্রাসাদে কস্তুরবা ও মহাদেব দেশাই তাঁর সঙ্গে বন্দী ছিলেন। দু'জনেই জেলে মারা গিছলেন। জেল চৌহদ্দির মধ্যে তাঁদের দেহ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। গান্ধী তাদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন, "এরা 'করব অথবা মরব' মন্ত্র পালন করে স্বাধীনতার বেদীমূলে প্রাণ বলি দিয়ে অমর হয়ে গেছে।"

অহিংস জননায়ক

দক্ষিণ আফ্রিকায় জননায়ক গান্ধীর পূর্ণবিকাশ ঘটেছিল, তিনি দুঃখদহনের তাপে পুড়ে খাঁটি মানুষ হয়ে ওঠেন। ডার্বানে ২৩ বছর বয়সে পদার্পণ করার পূর্বে গান্ধী শান্ত ভীরু লাজুক নবযুবক ছিলেন। অজানা মহাদেশে পা দিয়েই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে গোরা সাহেবরা কালাআদমী ভারতীয়দের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, তাদের 'কুলি' বলে ডাকে। পরদেশে পৌঁছে, তৃতীয় দিনে আদালতে যাবামাত্র ম্যাজিস্ট্রেট, গান্ধীকে পাগড়ি খুলতে হুকুম করেন। অপমানিত ব্যারিস্টার সে কথা অগ্রাহ্য করে তৎক্ষণাৎ আদালত ছেড়ে চলে যান।

হপ্তাখানেক পরে আইনী কাজের জন্য গান্ধী ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসে অন্য এক শহরে যাত্রা করেন। পরের স্টেশনে গাড়ী থামার সঙ্গে সঙ্গে একজন চেকার তাঁকে কুলিদের তৃতীয় শ্রেণীতে গিয়ে বসার হুকুম দেয়। তাঁর প্রথম শ্রেণীতে বসার অধিকার আছে এ যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করামাত্র তাঁকে হেঁচকাটানে প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে দেওয়া হয়, ট্রেনটি চলে যায়। এই অপমানে গান্ধী খুব বিচলিত হন। আধা-অন্ধকারে রেলের বিশ্রামঘরে বসে তিনি চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন। কি করবেন তিনি? এই ভারতবিদ্বেষী দেশ ছেড়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবেন, না সেখানে থেকে ন্যায্য অধিকার দাবি করে লড়বেন? দেশের মান রাখার দায় মাথায় তুলে নিয়ে গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকবেন স্থির করেন। সেই দুঃখময় রাতে গান্ধীর জীবনের ভবিষ্যৎ কার্যধারা নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

যাত্রার বাকী পথটুকু এক সরকারী ডাকগাড়ীতে যেতে হয়। সে ঘোড়াগাড়ীর ভেতরে তাঁর বসার ঠাঁই জোটেনি। তাঁকে বাইরে কোচ-বাক্সে গাড়োয়ানের পাশে বসতে হয়। অল্পকাল পরে এক মুরুব্বী সাহেব গান্ধীকে সে জায়গা ছেড়ে পাদানে বিছোনো চটের ওপর বসতে হুকুম করে। গান্ধী জায়গা ছাড়তে অস্বীকার করায় জোয়ান সাহেবের কিলচড়-ঘুষি খেয়েছিলেন। শহরে পৌঁছেও এক নামী হোটেলে থাকবার অধিকার পাননি। এক পরিচিত ভারতীয়ের দোকানঘরে সে রাতে আশ্রয় নেন। তিনি গান্ধীর অবমাননার কথা শুনে সমবেদনা জানিয়েছিলেন। কিন্তু বিশেষ অঘটন কিছু ঘটেছে এমন বিস্ময় প্রকাশ করেননি। কারণ ও একুশে-আইনের দেশে অমন অন্যায় অশোভন কাণ্ড প্রায়ই ঘটত, ভারতীয়রা এ দুর্ব্যবহারে অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা ওদেশে টাকা রোজগার করতে গিয়েছিলেন, আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়েই তা করতে হত। তাঁদের এ দাস্যভাব দেখে গান্ধী আহত হয়েছিলেন। নাছোড়-বান্দা হয়ে এর বিহিত করা দরকার বুঝে তিনি খবরের কাগজে, রেল কোম্পানী ও ডাকগাড়ীর কর্তৃপক্ষকে প্রতিবাদ জানিয়ে পত্র লিখে হৈ চৈ বাধিয়েছিলেন। রাতারাতি 'অবাঞ্ছিত অতিথি' বলে তাঁর প্রচার ঘটেছিল।

কিছুদিন পরে গান্ধী জানতে পারেন যে ভারতীয়রা ওদেশে ফুটপাতে চলতে পায় না, রাত ৯টার পর পথ চলতে পায় না, ট্রামগাড়ির সামনের আসনে বসতে পায় না। নির্দিষ্ট কুলি বসতিতে তাঁদের থাকতে হয়। ভারতীয় পদ্ধতিতে বিয়ে ওদের নজরে বেআইনী, পরিণীতা স্ত্রীর সন্তান জারজ বলে গণ্য হয়। তাঁর সাহেব বন্ধুরা তাঁর জন্য বিশেষ সুবিধা-ভোগের সুপারিশপত্র দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু গান্ধী সে সুযোগ নিতে অস্বীকার করেন। ব্যক্তিগত মান্য, সুখসুবিধা ভোগ করার জন্য তিনি উৎসুক ছিলেন না, সাদাকালোর ভেদভাব দূর করে তিনি জাতির মর্যাদা বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। অপমানকারীদের সাজা দেওয়া তাঁর লক্ষ্য ছিল না।

তিনি ধীরে ধীরে প্রবাসী ভারতীয়দের কি কি দুর্ভোগ ভুগতে হয় তার ফিরিস্তি জোগাড় করেন এবং সেই শহরের প্রত্যেকটি ভারতীয়ের কষ্ট, অনুযোগ জেনে নেন। পক্ষকাল পরে জনসভা ডেকে ভারতীয়দের জীবনধারা বদল করে ব্যবসার লেনদেনে সৎ হতে, পরিচ্ছন্ন হতে এবং জাতিধর্মপ্রদেশিকতার তফাত ভুলতে পরামর্শ দেন। সে সভায় সাহেব-দের লক্ষ্য করে তিনি শাপগাল দেননি। নিজেদের চালচলন যথাযথ হলে, সৎশোভন হলে তাঁরা মানুষের মতো বাঁচার অধিকার সহজে দাবি করতে পারবেন এই কথাটা তিনি দেশবাসীদের বোঝাতে চেষ্টা করে-ছিলেন। পেশাগত কাজে অত্যন্ত-ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি দরিদ্রতম গিরমিটিয়া মজুর বা ফল-সবজির ফেরিওলার সঙ্গে যোগ রেখে তাদের দুঃখদুর্দশার কাহিনী শুনতেন।

বছরখানেক পরে ভারতীয়দের যেটুকু ভোট দেবার অধিকার ছিল তাও রদ করে দেবার জন্য একটা আইন চালু করার প্রস্তাব হয়। গান্ধী দেশবাসীদের সেটার বিরোধ করার পরামর্শ দেন। তাদের অনুরোধে নেতৃত্ব গ্রহণ করে তিনি স্বেচ্ছাসেবকদল গড়েন, খৃষ্টান যুবকদের, মুসলিমও পার্শী ব্যাপারীদের এবং হিন্দু কেরানীদের আর মজুরদের সমবেতভাবে আত্মহিতার্থে কাজ করতে শেখান। প্রতিবাদপত্রের নকল করায়, চাঁদা তোলার কাজে আর এই নব জাগরণের বাণী শহরের উপকণ্ঠের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য বহু কর্মী রত হয়। একমাসের মধ্যে তহবিলে অনেক চাঁদা জমা হয়, প্রতিবাদীদের ১০,০০০ সই জড় হয়। সে প্রতিবাদের ছাপানো চিঠি সেখানকার ল্যাট, প্রধানমন্ত্রী, ভারতের বড় লাট ও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে এবং নাতালের, ভারতের ও ইংলণ্ডের মুখ্য পত্রিকা-সম্পাদকদের কাছে পেশ করা হয়। ফলে ওদেশে ভারতী-য়দের প্রতি যে অবিচার চলছিল তার ব্যাপক প্রচার ঘটে। সে কালা-আইন পাশ হয়ে যায়, ভারতীয়রা ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত হয় কিন্তু তারা তাদের জড়তা ভীরুতা বর্জন করতে শেখে, সরকারের বেআইন পাশ করার অধিকারের বিচারবিরোধ করার সাহস পায় উনিশ শতকের শেষ ভাগে।

গান্ধী 'নাতাল কংগ্রেস' নামে ভারতীয়দের এক সমিতি গঠন করে তার কার্যক্রম বেঁধে দেন এবং সভ্যদের কাছ থেকে নিজে চাঁদা সংগ্রহ করতে থাকেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশ বছর বাসকালে গান্ধী এমন আরো কয়টি কালাআইনের বিরোধ করেছিলেন, শত শত আবেদন প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে মোকাবিলা করে আলাপ চালিয়েছিলেন। এক আইন ভারতীয়দের কাছ থেকে মাথা-পিছু ৪০ টাকা খাজনা চেয়েছিল, অন্যটা তাদের দাগী আসামীদের মতো দশ আঙুলের টিপছাপগুলা ছাড়পত্র সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করতে বলে ছিল। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' সাপ্তাহিকের সম্পাদক হিসেবে শত শত প্রবন্ধ লিখে, একক প্রচেষ্টায় গান্ধী ভারতীয়দের সংগঠিত করে ছিলেন। যখন লেখা ও বক্তৃতা মারফত আন্দোলন নিষ্ফল হয়েছিল তখন তিনি সত্যাগ্রহ অথবা অহিংস অসহযোগ নামে এক নতুন অস্ত্রের শরণ নিয়েছিলেন।

টিপছাপ দেবার হুকুম অমান্য করে এক দীর্ঘমেয়াদী লড়াইয়ের জন্য তিনি দেশবাসীদের প্রস্তুত হতে বলেন। কেবলমাত্র তাঁর ওপর নির্ভর-শীল না হয়ে জেনে বুঝে তাঁর কার্যধারা গ্রহণ করলে তাঁরা লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন এটা বুঝিয়ে দেন। একথাও বলেছিলেন যে, "আমি তোমাদের প্রাণের মায়া ত্যাগ করতে বলি। স্বেচ্ছায় দুঃখ জ্বালা সহ্য করাই অবিচার রদ করার প্রকৃষ্ট পন্থা।" তাঁর নির্দেশগুলি তিনি জন-সভায় হিন্দী, গুজরাতী ও তামিলতেলেগু ভাষায় ব্যাখ্যা করে দিতেন। তাঁর সেনাদল সম্পূর্ণ অহিংসভাবে লড়াই করার শপথ নিয়েছিল। অশিক্ষিত পথচারী, কারিগর, ফেরিওলা, খনির মজুর, ধনী বণিক ও অব-গুণ্ঠিতা কুণ্ঠিতা মেয়েরা তাঁর বাহিনী গড়ে তুলেছিল। গান্ধী পায়ে হেঁটে ৫০০০ নিরস্ত্র শান্ত সংযত শৃঙ্খলাবদ্ধ সেনা নিয়ে যাত্রা করে তাদের সঙ্গে কদম মিলিয়ে পথ চলেছিলেন, খোলা আকাশের নীচে মাঠে শুয়েছিলেন, জলবৎ ডাল আর আধসিদ্ধ ভাত খেয়েছিলেন। পথশ্রান্ত অসুস্থ সঙ্গীদের তিনি শুশ্রূষা করতেন, পিছিয়ে পড়া সাথীদের উৎসাহ

দিতেন, সকলের জন্য রাঁধতেন আর বাঁধামাপের খাবার ভাগবাঁটোয়ারা করতেন। তাঁর মনের বল ছিল অটল, শরীরের শক্তি ছিল বিস্ময়কর।

এই প্রথম সত্যাগ্রহে প্রায় ২৫০০ মানুষের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল, ১০০০ জন সর্বস্বান্ত হয়েছিল এবং কয়েকজন প্রাণ হারিয়েছিল। নেতা গান্ধীর সঙ্গে বন্দী সঙ্গীরা, আরামে বিলাসে লালিত ধনীমানীরা পাথর ভাঙত, মাটি কোপাত, মেথরগিরি করত। সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে কস্তুরবা এবং কয়েকটি মুসলিম মহিলাও কয়েদভোগ করেছিলেন। বিরাট সত্যাগ্রহীবাহিনী ও তাদের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য গান্ধীকে রোজ ৩০০০ টাকা খরচা করতে হত। চাঁদার জন্য যখন ভারতে আবেদন করা হয়েছিল তখন মেয়েরা গহনা খুলে দিয়েছিলেন; রাজারা, ব্যবসায়ীরা হাজার হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও টাকা সংগ্রহ করে পাঠিয়েছিলেন। ইংলণ্ডে গান্ধীর অভিনব আন্দোলনের স্বপক্ষে সহানুভূতি জাগে, ভারতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে এ সমস্যার জবর আলোচনা হয়। ইংরেজ সভাপতি ওয়েডারবার্ন বলেছিলেন, "দক্ষিণ আফ্রিকার বিবরণী থেকে হিন্দু মুসলিম একযোগে ভারতের কী সেবা করতে পারে তার দৃষ্টান্ত মেলে। গান্ধীর অদ্ভুত নেতৃত্বে ভারতীয়রা যে কঠিন পণ নিয়ে লড়ছে তার জন্য তাদের সাধুবাদ জানাচ্ছি।" কয়েকবছর সত্যাগ্রহ লড়াইয়ের পর দু'পক্ষে সন্ধি হয়, ভারতীয়রা কিছু কিছু নাগরিক অধিকার লাভ করে। আত্মসম্মান বজায় রেখে বিপক্ষের সঙ্গে রফা করায় গান্ধী সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন।

বিশ বছর প্রবাসবাসের পর গান্ধী ভারতে ফেরেন। তখন দেশে বহু গণ্যমান্য নেতা ছিলেন তবু চম্পারণে নীলকরের অত্যাচারে নিপীড়িত চাষীরা, অজন্মায় অভাবগ্রস্ত খেড়া ও বারদোলীর চাষীরা, মাগ্যিভাতার দাবিদার আহমেদাবাদের মিল মজুররা গান্ধীর শরণ নিয়েছিল। তাঁর মধ্যস্থতায় শতাধিক বছরের পুরানো বাধ্যতামূলক নীলচাষ করার প্রথা লোপ পায়, চুক্তি করে বিদেশে শ্রমিক সরবরাহ করার কুপ্রথা রদ হয়। কোনও স্থানীয় উৎপাত অসুবিধার বিহিত

করার সময় গান্ধী সেখানকার বাসিন্দাদের ডাক দিতেন এবং এ জাতীয় সকল আন্দোলনকেই ক্রমশঃ ব্যাপকভাবে ছাড়িয়ে দিয়ে দেশের সকল মানুষের মনে নাড়া দিতেন।

ভারতে সত্যাগ্রহ চালাবার সময় গান্ধী একই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি বারবার ভারতের শহরে গ্রামে ঘুরে স্থানীয় সমস্যার গুরুত্ব এবং প্রতিরোধকারীদের শক্তির মাপ জেনে নিয়ে লড়াই চালাবার নির্দেশ দিতেন। এসব তদ্‌বিরতদন্ত করার জন্য দরকার হলে তিনি দিনে ১৮।২০ ঘণ্টা খেটে হাজার হাজার প্রতিবাদী লোকের সঙ্গে আলাপ করে লিখিত তথ্য সংগ্রহ করতেন। আইন অমান্য করার সময়ও কিভাবে নিয়ম শৃঙ্খলা মানতে হবে তিনি বহু জনসভায় তার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

অহিংস অস্ত্র বেছে নেওয়ার সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলেন, "দেশের সামনে আরো একটি পন্থা আছে সেটি হচ্ছে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করা। তা করা সম্ভব হলে হয়ত ভারত অহিংসার মন্ত্র কাণে নিত না। বক্তৃতা দিয়ে আর শোভাযাত্রা করে তোমরা স্বরাজ পাবে না। মন্ত্রের সাধন করার যোগ্য কঠিন মরণপণের বিশেষ দরকার। রণে ভঙ্গ দিয়ে পালায় না এমন সাহসী সৈনিক হওয়া আমাদের লক্ষ্য। নিজ প্রাণ বলি দেবার জন্য প্রস্তুত হও। তার জন্য বীরোচিত বীর্যের প্রয়োজন। অন্যকে হনন করার পরিবর্তে আত্মবলি দিতে শেখো। প্রাণ বিপন্ন করে অন্যের প্রাণ হরণ করা যদি সহজ মনে হয় তো অন্যের প্রাণক্ষয় না ঘটিয়ে আত্মবিসর্জন দেওয়া কঠিন মনে হবে কেন? জীবন নাশ করা বীরত্বের পরিচায়ক নয়। নিজের সম্মান ও স্বাধীনতার জন্য মরতে শেখো।" তাঁর 'করব অথবা মরব' মন্ত্রের অর্থই ছিল দুঃখদহন সহ্য করা। তিনি জানতেন যে এই আত্মদহনই স্বাধীনতার দীপ জেলে দেবে, প্রতিপক্ষের মন টলিয়ে দেবে।

শিশু, বৃদ্ধ, বনিতা, সবাই গান্ধীর অহিংস বাহিনীর অঙ্গ হতে পারত। শিশুসৈনিকরা 'বানরসেনা' নামে খ্যাত হয়েছিল। তাঁর সৈন্যরা হিংস্র আচরণ করলেই তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন থামিয়ে দিতেন। লুকোচুরি

করে কিছু করতে পছন্দ করতেন না বলে সর্বদা শত্রুপক্ষকে তাঁর কার্য-ধারা প্রকাশ করে দিতেন। তিনি কখনও তাঁর সহকর্মী বা বাহিনীর মনে বৃথা আশা জাগাতেন না। আত্মরক্ষার জন্য আঘাত না হেনে বিপক্ষের লাঠি ও গুলিতে জখম হতে হবে, জেলফাঁসি যেতে হবে একথা জানিয়ে দিতেন।

বিদেশী বস্ত্রের বহ্নি উৎসব করা, সরকারকে কর না দেওয়া, লবণ আইন ভঙ্গ করা, সরকারী বিদ্যালয় ও আদালত বর্জন করা, ধর্ণা দিয়ে মদ ও বিলেতী কাপড়ের ব্যবসা অচল করা প্রভৃতি নেতিবাচক আন্দোলন চালনা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেশের মানুষদের বহু গঠনমূলক কাজ করতে ডাক দিয়েছিলেন ; সুতো কাটতে, মুন বানাতে, গ্রামপঞ্চায়েতের পুনরুদ্ধার করতে এবং স্বদেশী শিক্ষায়তন স্থাপন করতে বলেছিলেন। তাঁর প্রস্তাবিত 'একবছরে স্বরাজলাভে'-এর প্রয়াস সার্থক সফল হয়নি কিন্তু দাস মানুষের মন থেকে ভীরুতার শেকল খসে গিয়েছিল। অসহায় বন্দী আত্মা মুক্ত হয়েছিল। জনজাগরণের ফলে দেশ এগিয়ে গিয়েছিল। তাঁর দণ্ডীযাত্রা লোকের মনে যাদুমন্ত্রের কাজ করেছিল। পর্দার আবরণ ছিঁড়ে শত শত গ্রামের মেয়ে লবণ তৈরি করার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, মেয়েরাও যে পুরুষের সঙ্গে কদম মিলিয়ে দেশসেবা করতে পারে তা প্রমাণ করেছিল। ভারতের রাষ্ট্রীয় জাগরণের ইতিহাসে গান্ধীই প্রথম ব্যাপকভাবে অহিংস অসহযোগের প্রয়োগ করেছিলেন।

হিংসযুদ্ধের মারণাস্ত্র বর্জন করলেও গান্ধী প্রায়ই হিংসযুদ্ধের ভাষা ব্যবহার করতেন। বলতেন, "আমি যুদ্ধে চলেছি। সুতোর গোলা তোমাদের সীসের ছটরা, চরকা তোমাদের বন্দুক। একজন আফ্রিদি যেমন বন্দুক ছাড়া থাকে না তেমনিই প্রত্যেকটি অহিংস যোদ্ধার চরকা ছাড়া থাকা উচিত নয়। তোমরা ধারাসানার মুনগোলা লুঠ কর—এটা ধারাসানার যুদ্ধ নামে খ্যাত হবে।" সাহসিকতা, বীর্য, স্বদেশপ্রেম, সহনশীলতা ও আত্মবিসর্জনাদি সৈনিকের বহুবৃত্তির অনুশীলন তিনি করেছিলেন।

কাপুরুষতার চেয়ে গান্ধী হিংসযুদ্ধের সমর্থন করতেন সত্য, তবু পশুশক্তির চেয়ে আত্মবলকে বেশী মূল্য দিতেন। "পারমাণবিক বোমা কি আপনার অহিংসায় বিশ্বাস নড়িয়ে দেয়নি ?" এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "তাতো করেইনি বরং দেখিয়ে দিয়েছে যে পৃথিবীতে সত্য অহিংসাই সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। এদের সামনে পারমাণবিক বোমাও নিস্ফল।" গান্ধী বারবার জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, ভারত অহিংসভাবে স্বাধীনতা লাভ করতে পারলে, জগতের সকল নিপীড়িত দাসজাতির মনে আশার আলো জ্বলে উঠবে। গান্ধীর এ ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। এশিয়া ও আফ্রিকায় একাধিক দেশ বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা লাভ করেছে। আমেরিকার নিগ্রোরা গান্ধীর অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে মানুষের মতো বাঁচার অধিকার চেয়ে লড়ছে।

নিরলস লেখক

কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস বা নাটক লিখে গান্ধী লেখকরূপে খ্যাত হননি। সত্য, অহিংসা, চরকা ও স্বাধীনতার ব্যাখ্যা করে এবং দেশকে নতুন ঢঙে গড়ে তোলার উপযোগী নানা পরামর্শ দিয়ে তিনি শতাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ ও বক্তৃতা সাজিয়ে একত্র করে ছাপিয়ে অনেক মূল্যবান বই হয়েছে এবং ভাল লেখক হিসেবে তাঁর নাম রটেছে। তাঁর সকল লেখার মধ্যে নীতিশিক্ষা দেবার চেষ্টা ফুটে উঠলেও সহজ, স্বচ্ছন্দ ও সংযত ভাষায় যথাযথ বর্ণনা দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করায় তিনি পটু ছিলেন। তাঁর জীবনধারা এবং আচরণের মতো তাঁর লেখা ছিল সরল, স্পষ্ট ও সংবদ্ধ। সাহেব লাটবাহাদুররা স্বীকার করেছিলেন যে গান্ধী খুব ভাল ইংরেজী লিখতেন এবং প্রতিটি শব্দের মূল মর্ম বুঝে বাছাই করা শব্দ ব্যবহার করতেন। অক্সফোর্ডের এক অধ্যাপক গোলটেবিল বৈঠকের সময়ে গান্ধীর লেখার মুসাবিদা করতেন। তিনি বলেছিলেন, "গান্ধীর মতো ইংরেজী অব্যয়ের ব্যবহার-জ্ঞান আমি আর কোনও ভারতীয়ের লেখায় দেখিনি···আমি সযত্নে তাঁর লেখা মুসাবিদা করে তাঁর কাছে পেশ করতুম। তাতে এক লহমা চোখ বুলিয়ে গান্ধী দু'একটা শব্দের অদলবদল করে দিতেন, তাতেই কাজ হত। আমার ইংরেজী রূপ বদলে গান্ধীর ইংরেজী হয়ে যেত।"

পাঠকের মন জয় করার জন্য গান্ধী কখনও সাজিয়ে-ফাঁপিয়ে, ভাষার আড়ম্বর দেখিয়ে কিছু লিখতেন না, প্রতিটি কথা ওজন করে,

চিন্তা করে ব্যবহার করতেন, তার ফলে তাঁর লেখার মধ্যে তাঁর মনের আশাআকাঙ্ক্ষা, দুঃখবেদনা ফুটে উঠত, কোনও কৃত্রিম আড়ষ্টতা থাকত না। তিনি প্রথম যে মুসাবিদা করতেন তাতে বিশেষ কাটাকুটি থাকত না। পরেও ভাষার বেশী রদবদল করতে হত না। তাঁর সংযত চরিত্রের সুসংবদ্ধ চিন্তার ফলে এটা সম্ভব হত। গান্ধী ইংরেজী সাহিত্য ভালবাসতেন, খুব মন দিয়ে বাছাই করা ইংরেজ কবি ও লেখকের বই পড়তেন। বাইবেলও সযত্নে পড়েছিলেন। সম্ভবত সেজন্য তাঁর কান ও হাত লাগসই ইংরেজী শব্দ চয়ন করায় পটু হয়ে উঠেছিল।

বিলেতে ছাত্র অবস্থায়, ১৬ বছর বয়সে, গান্ধী 'লণ্ডন গাইড' নামে যে ছোট বইটি লিখেছিলেন তাতে ভারতীয় ছাত্রদের জন্য লণ্ডনের খবরাখবর দিয়েছিলেন। তারপরে লেখেন 'ইংরেজের প্রতি আবেদন' ও 'ভারতীয় ভোটাধিকার'। প্রথমটিতে নাতালে ভারতীয়দের দুরবস্থার কথা আর দ্বিতীয়টিতে নাতালে ভারতবাসীদের ভোট দেবার ইতিহাস ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। স্বাস্থ্য ও খাদ্য সম্পর্কে তাঁর নানা পরীক্ষার ফলাফল গান্ধী গুজরাতী ভাষায় 'স্বাস্থ্যের চাবিকাঠি (স্বাস্থ্যরক্ষা)' বইয়ে লিপিবদ্ধ করেন। বইটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল; ভারতের ও বিদেশের নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় কালাআদমী ভারতীয়দের সাহেবদের সঙ্গে এক গাড়ীতে বসে যাবার, রাত ন'টার পর পথ চলার, ফুটপাত মাড়িয়ে হাঁটার, একহোটেলে থাকার বা ভোট দেবার অধিকার ছিল না। ভারতীয়রা আলাদা এলাকায় বাস করত, মাথাপিছু বাড়তি খাজনা দিত আর দাসের মতো নীচু হয়ে থাকত। পরের পুস্তিকা 'সবুজপত্র'-এ গান্ধী ২৪ বছর বয়সে এ সব অবিচারের বর্ণনা করেন। বইটি ভারতে ছাপা হয়। প্রথমে তিনি এর কয়েক হাজার কপি বিলি করতে মনস্থ করেন। অত কাজ একা সামলান কঠিন ছিল। তিনি পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ভাব করে তাদের সাহায্য নিয়েছিলেন। তারা ছুটির দিন সকালে তিনঘণ্টা খাটত, খাটুনির বদলে তাঁর কাছ

থেকে বিদেশী ডাকটিকিট ও স্নেহাশিস পেত। সবশুদ্ধ বইটির ১৪০০০ কপি ছাপা হয়। দ্বিতীয় সংস্করণও বের হয়। কাগজে এ বইয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার সাহেবরা বেজায় চটে গিয়েছিল। গান্ধী ভারত সফর সেরে ডার্বানে পৌঁছবামাত্র সাহেবরা তাঁকে খুব মারপিট করে। এ ঘটনা থেকে গান্ধীর এই শিক্ষা হয়েছিল যে তাঁর লেখার কাটছাঁট করা বিপজ্জনক। তিনি স্বভাবতঃ সংক্ষেপে লিখতেন। কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতি ও বহু প্রস্তাব তিনি গুছিয়ে লিখে দিয়েছিলেন। শিশুদের গান্ধী ভালবাসতেন। চিঠিতে তিনি আশ্রমের ছেলেমেয়েদের 'ছোটপাখী' বলে সম্বোধন করতেন। জেল থেকে প্রতিহপ্তায় তিনি ছোটপাখীদের মজার অথচ শিক্ষামূলক পত্র লিখতেন। গান্ধী বিশিষ্ট পত্রলিখিয়ে ছিলেন। দিনে ৫০ খানা চিঠি নিজে হাতে লিখতে পারতেন। তাঁর চিঠিপত্র তাঁর লেখার এক বিশেষ অঙ্গ। বিভিন্ন মানুষকে তিনি সারাজীবনে প্রায় একলাখ পত্র লিখেছিলেন। শিশুদের জন্য 'বালপোথী' ও 'নীতিধর্ম' নামে যে বই লিখেছিলেন তাতে কিছু শিক্ষামূলক উপদেশ ও জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা আছে। শিশুরা যা তোতাপাখীর মতো কপচাবে অথচ জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে না এমন কিছু তিনি তাদের বইয়ে লিখতে চাইতেন না।

কারো সঙ্গে তর্কবিবাদ করার কালেও তিনি মাথা ঠাণ্ডা রেখে যুক্তিপূর্ণ কথা লিখতে পারতেন। লেখার ঝোঁক এলে চলন্ত ট্রেনে ও নড়ন্ত জাহাজে তিনি লেখা চালাতেন। তাঁর 'হিন্দ্ স্বরাজ' তিনি বিলেত থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফেরার পথে জাহাজে একটানা দশ দিনে লিখেছিলেন। জাহাজের নামছাপা লেখার কাগজে এর পাণ্ডুলিপি লেখা হয়। এটি আধুনিক সভ্যতার কঠোর সমালোচনায় ভরা এবং দু'জন মানুষের কথোপকথনের ভঙ্গীতে সাজান। মনীষী টলস্টয় এ বইটি পড়ে অন্যায়ের সঙ্গে অসহযোগের তারিফ করে গান্ধীকে সাবাস জানিয়েছিলেন। আর একবার ট্রেনে গান্ধী 'গঠনমূলক কার্যক্রম'

নামক পুস্তকটি লিখেছিলেন। ভারতের নতুন সমাজ গড়ার কাজ প্রত্যেককে কেমনভাবে হাতেনাতে করতে হবে, গ্রামের সাফাই, সুতাকাটা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাজ কিভাবে করতে হবে তা ও বইয়ে স্পষ্টভাষায় লেখা আছে।

'দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ' আর 'জেলের অভিজ্ঞতা' গান্ধী বন্দী অবস্থায় লিখেছিলেন। কোনও বই অথবা পত্রপত্রিকার সাহায্য না নিয়ে, স্মরণশক্তির ওপর নির্ভর করে তিনি এ সব পুরানো ঘটনার বিবরণ লিখেছিলেন। তাঁর 'আত্মকথা'র দু'চার অধ্যায় জেলে লেখা, বাকীটা জেলের বাইরে এসে শেষ করেন। সে লেখা ধারাবাহিক ভাবে গুজরাতী সাপ্তাহিক 'নবজীবনে' ছাপা হয়, পরে বইয়ের আকারে ছাপা হয়। এ আত্মকথা বা সত্যের প্রয়োগ ভাল সাহিত্যরূপে গণ্য হয়েছে। বিশ্ববন্দিত মহাত্মার ঘরোয়া জীবনের কথা ছাড়াও এতে তাঁর মা, বাবা, স্ত্রী, বন্ধুদের সংক্ষিপ্ত সুন্দর ব্যাখ্যা এবং বহু নাটকীয় ঘটনার বর্ণনা আছে। জীবনকথার মাঝে মাঝে ফাঁক রেখে এবং কথোপকথনের টুকরো মিলিয়ে তিনি এ রচনা এমন রসাল করেছেন যে এ লেখা পড়তে পড়তে পাঠকের ঔৎসুক্য ক্ষীণ হয় না, ক্লান্তি আসে না। বাঙলা, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি নানা ভারতীয় ভাষায় এবং ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, রুশ, চীনা, জাপানী প্রভৃতি বহু বিদেশী ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে। অনেক কঠিন বিষয় গান্ধী পুরাণ, কোরান থেকে উপমা দিয়ে চমৎকার ভাবে বুঝিয়ে দেন। তাঁর লেখার মাঝে রামসীতা, কৃষ্ণ, দ্রৌপদী, হজরৎ মহম্মদ, আবুবেকর ইত্যাদির স্বচ্ছন্দ উল্লেখ আছে। সরকারের সঙ্গে অসহযোগ হিন্দুধর্মের প্রতিকূল বলে এক পণ্ডিত গান্ধীর বিরোধ করামাত্র গান্ধী প্রহ্লাদ, বিভীষণ ও মীরাবাঈয়ের ধর্মপক্ষ নিয়ে অধর্মের সঙ্গে অসহযোগের উদাহরণ উল্লেখ করেছিলেন। গীতার নতুন ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, "গীতায় কৌরবপাণ্ডবের নাম করে লেখক আসলে মানুষের মনে কু ও সু-এর দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন।"

গান্ধী সর্বদা লোকসেবার কথা ভাবতেন। সাধারণ লোকের মনে

সুন্দর ভাব, সৎ চিন্তা ও কল্যাণের প্রতি আগ্রহ জন্মিয়ে দিতে পারেন যে লেখক তাকেই তিনি বড় মনে করতেন। গুজরাত সাহিত্য সভায় লেখকদের বলেছিলেন, "আপনারা কি দেশের লক্ষ লক্ষ মূক ভাইদের আশা, আনন্দ, অভাবের কথা ভেবে দেখেছেন? কাদের জন্য আমরা সাহিত্য সৃষ্টি করব? যে দুঃখী চাষী কুয়ো থেকে জল তোলে আর অকথ্য ভাষায় বলদদের গাল দেয় তার জন্য কি করা হবে? বহুদিন আগে আমি এমন-ছড়া বা গীত লিখে দিতে বলেছিলুম যা চাষীরা খুশীমনে গাইতে গাইতে কাজ করবে আর জঘন্য ভাষার গালমন্দ ভুলে যাবে। এমন শত শত গ্রামবাসীর জন্যে আমি সাহিত্য চাই। বিলেতের ডীন্ ফারার্ খৃষ্টের জন্মস্থান প্রভৃতি খুঁটিয়ে দেখে, অতি সরল ভাষায় জনসাধারণের জন্যে বোধগম্য খৃস্টজীবনী লিখেছেন। আমি চাই আমাদের সাহিত্যিকরা অমনভাবে গ্রামে থেকে, গ্রাম্যজীবন অনুভব করে, নতুন প্রাণসঞ্চার করে এমন সহজ সাহিত্য সৃষ্টি করুন।"

গান্ধীকে তাঁর প্রিয় দার্শনিক কবি রায়চাঁদ ভাইয়ের জীবনী লিখতে অনুরোধ করায় গান্ধী বলেছিলেন, "তাঁর জীবনী লিখতে হলে আমাকে তাঁর ঘরদোর, খেলার মাঠ, সঙ্গীসাথী, সহপাঠী, আত্মীয়, সহকর্মী, সব কিছুর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হবে।" জীবনী লেখার ব্যাপারেও রঙীন কল্পনাবিলাসের চেয়ে সত্যের প্রয়োগ তাঁর দিগ্‌দর্শক মাপকাঠি ছিল।

ইংরেজী সাহিত্য গান্ধীর খুব প্রিয় ছিল। বলতেন, "দেশের জন্যে যদি সত্যি কিছু আমি ত্যাগ করে থাকি তো সে আমার ইংরেজী সাহিত্য প্রীতি, টাকা ও নাম আমার কাছে তুচ্ছ ছিল।" টলস্টয় ও রাস্কিনের কিছু কিছু লেখা এবং সক্রেটিসের অদ্ভুত জীবন বলিদানের কাহিনী অবলম্বন করে তিনি 'সর্বোদয়' ও 'সত্যাগ্রহীর কথা' লিখেছিলেন। গান্ধী খুব ভাল তর্জমা করতেন, ঠিক লাগসই কথা বেছে নিয়ে প্রকৃত অর্থ বোঝাতে পারতেন। এক সহকর্মীর Death Dance-এর তর্জমা নাকচ করে তিনি 'পতঙ্গ নৃত্য' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। জেলে

তিনি ভারতীয় সন্ত কবিদের রচনা ইংরেজীতে তর্জমা করেছিলেন; সে বই 'বন্দীশালার সাথী' নামে ছাপা হয়েছিল।

গান্ধী প্রায়ই বলতেন যে তিনি ভাবুক লেখক নন কারণ তিনি অন্যের সৃষ্টির দাস—"কবি তাঁর বাঁশীর সুরের তালে তালে গোপিনীদের নাচাতে পারেন আর আমি আমার প্রিয়া সীতার (চরকার) সন্ধানে রত, তাকে দশমুণ্ড রাক্ষস জাপান, প্যারিস ও ম্যাঞ্চেস্টারের কবলমুক্ত করতে ব্যগ্র। কবি নিত্য নূতনের সৃষ্টি করেন, আমি অন্যের সৃষ্ট জিনিস আঁকড়ে থাকি।" অথচ তাঁর নানা লেখায় মাত্র কয়েকটি বাক্যের বন্ধনে তিনি অতি স্পষ্ট মধুর ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারতেন ঃ—

"মহীশূরে আমি পাথরে-গড়া ছোট্ট একটি মূর্তি দেখেছিলুম। একটি অর্ধ উলঙ্গ মেয়ে কামদেবের শরাঘাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য তার এলোমেলো কাপড় সামলাতে চেষ্টা করছে। কামদেব পরাহত হয়ে একটি বৃশ্চিকের আকারে তার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে। সেই মূর্তিটির আকুলতা এবং বৃশ্চিকের যাতনা আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলুম।"

"উড়িষ্যা এবং তার কঙ্কালসার মানুষদের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে কি? সেই ক্ষুধার্ত, জীর্ণদেহ, দরিদ্র লোকেদের দেশ থেকে এমন সব মানুষ এসেছে যারা শিঙ, হাড় আর রূপোর ওপর এসব অঘটন ঘটিয়েছে। যাও, দেখে এস, কেমন করে শীর্ণ মানুষের মধ্যে বন্দী আত্মা জড়পদার্থে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়েছে।" এক গরীব কুমোর কাদার তাল থেকে যাদু মন্ত্রে এই শিল্প সৃষ্টি করেছে।"

"আমি কুমারিকা অন্তরীপে বসে লিখছি। আমার সামনে জলের ত্রিধারা এসে মিশে এমন ছবি এঁকেছে যা জগতে অতুলনীয়। এখানে কোনও জাহাজ নোঙর ফেলে না। চারিপাশের সাগরজল দেবীপ্রতিমার মতো পবিত্র, স্পর্শকলুষমুক্ত, চিরকুমারী। জনমানবশূন্য এ স্থান, ধ্যানের যোগ্য যথার্থ বেদীস্বরূপ।"

"অতি প্রত্যূষে আমি মালাবারে পা দিলুম। যখন আমি পূর্ব-

পরিচিত জনপদের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলুম তখন পূর্বসফরকালে দেখা নারাভির ছবি আমার চোখে ভেসে উঠল। অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে আলাপ আলোচনার সময়ে এক মর্মভেদী শব্দ শোনা গেল। আমার সঙ্গীরা বললে, 'আমরা আপনাকে একটি জীবন্ত নারাভি দেখাব।' জনপথে তার চলার অধিকার নেই তাই সে মাঠের মধ্য দিয়ে খালি পায়ে নিঃশব্দ পদক্ষেপে চলেছিল। আমি তাকে বললুম, 'এ জনপথে তোমার আমার চলার দাবি এক।' সে বলল, 'তা কখনও হতে পারে না, আমি যে এ পথে চলার অযোগ্য অধম।' তোমরা আমাকে তোমাদের সঙ্গে হাসতে, রঙ তামাশা করতে দেখ কিন্তু জেনে রেখো মালাবার ভ্রমণকালে এই সব হাসিঠাট্টার আড়ালে সেই নারাভির মুখ ও সেই করুণ দৃশ্য আমাকে বিঁধতে থাকবে।"

সত্যধর্মী সাংবাদিক

আঠারো বছর বয়সে ইংলণ্ডে পৌঁছবার পর গান্ধী নিয়মিতভাবে খবরের কাগজ পড়া শুরু করেন। ভারতে ছাত্র অবস্থায় তাঁর এ অভ্যাস ছিল না। তিনি তখন এত মুখচোরা আর ভীতু ছিলেন যে সভা-সমিতিতে কিছু বলতে গেলে ঘাবড়ে যেতেন, মুখে কথা জোগাত না। উনিশ বছর বয়সে 'ভেজিটেরিয়ান' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিকে তাঁর প্রথম লেখা ছাপা হয়। তাতে তিনি ভারতের নিরামিষ আহার, পালপার্বণ, আচার, ব্যবহার সম্বন্ধীয় নয়টি প্রবন্ধ লেখেন।

ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে তিনি মামলা সংক্রান্ত দলিল মুসাবিদা করা ছাড়া আর কিছু লেখালেখি করেননি। দু'বছর পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে কাগজে লেখার জন্য আবার কলম ধরেছিলেন। তারপর থেকে সে কলম তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রায় ৬০ বছর প্রতি হপ্তায় লেখা লিখেছিল, বিরাম বিশ্রাম নেয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকায় ২৪ বছর বয়সে পদার্পণ করার তিনদিন পরে গান্ধী ডার্বান আদালতে অবমানিত হন—সে ঘটনা তিনি ওখানকার কাগজে লিখে পাঠাবার পর রাতারাতি তাঁর নাম ছড়িয়ে যায়। এর পর তিনি বহুবার সংবাদপত্রে কালাআদমী ভারতীয়দের প্রতি সাহেবদের অবিচার অত্যাচারের ব্যাখ্যা ও প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তাঁর স্পষ্ট জোরাল অথচ সত্য ভাষায় লেখা বর্ণনা ও-দেশের লোকের মনে নাড়া দিয়েছিল।

তিনি ৩৯ বছর বয়সে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' সাপ্তাহিকের পুরো দায়িত্ব নেন। ঐ পত্রিকা মারফত তিনি প্রবাসী দেশবাসীদের সংগঠিত করেন, দাসত্ব মুক্তির পথ দেখান। তিনি জনমত গঠন করে সাদা ও কালোর

বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথমে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' ইংরেজী, হিন্দী, গুজরাতী ও তামিল ভাষায় ছাপা হত। সম্পাদক ও মুদ্রাকরের অভাবে, অত কাজ সামলান কঠিন হয়ে পড়ায় গান্ধী হিন্দী ও তামিল সংস্করণ ছাপা বন্ধ করে দেন। তিনি প্রতি সপ্তাহে অন্য দু'টি ভাষায় প্রবন্ধ লিখতেন, মহাপুরুষ ও মহীয়সী মহিলাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখতেন। অক্লান্ত ভাবে শ্রম করে, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিল্প, ভারতের রাজনীতি এবং দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের সত্যাগ্রহ লড়াইয়ের বিশদ বিবরণ দিতেন। দেশবিদেশের পাঠকরা তাঁর লেখা পড়ে প্রকৃত তথ্য জানতে পারত। বিখ্যাত পাঠকদের মধ্যে ইংলণ্ডে দাদাভাই নৌরজীর, ভারতে গোখলের এবং রাশিয়ায় টলস্টয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। দশ বছর গান্ধী এ পত্রিকা চালিয়েছিলেন। এই সম্পাদনার কাজ তাঁকে বাক্ সংযম শিখিয়েছিল, মানুষের মন বোঝার সুযোগ দিয়েছিল। নানা বাজে কথার আলোচনা না করেও তিনি সম্পাদক ও পাঠকের মধ্যে নিবিড় যোগ স্থাপন করতে চেষ্টা করেছিলেন। লোকশিক্ষা আর লোকসেবা তাঁর লক্ষ্য ছিল। তাঁর মতে "স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা জীবিকা অর্জনের জন্য পত্রিকা সম্পাদনা করা ভ্রষ্টাচার। সম্পাদকের বা পত্রপত্রিকার যত কিছু ক্ষতিই ঘটুক না কেন, দেশের মর্মবাণী লেখায় ফুটিয়ে তোলা দরকার। জনগণের মনে নাড়া দিতে গেলে নতুন ভাষায়, নতুন ঢঙে ভাব প্রকাশ করতে হবে।" কাগজের মাধ্যমে সত্যের সন্ধান দেওয়া যায়, সৎ ভাবধারা ও আদর্শ প্রচার করা যায় এ বিশ্বাস তাঁর ছিল।

গান্ধী যখন 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন'-এর ভার নেন তখন সে কাগজ লোকসানে চলছিল। মাত্র ৪০০ কপি কাগজ বিক্রি হত প্রতি সপ্তাহে। ওটা চালু রাখার জন্য গান্ধী কয়েকমাস ওর পিছনে মাসে ১২০০ টাকা ব্যয় করেছিলেন। সবশুদ্ধ তিনি ২৬০০০ টাকা লোকসান দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও বছর কয়েক পরে তিনি কাগজে বিজ্ঞাপন না ছাপার সিদ্ধান্ত নেন। সত্যের প্রতি অটুট শ্রদ্ধা তাঁকে বিজ্ঞাপন বর্জন করার প্রেরণা দিয়ে-

ছিল। বিজ্ঞপ্তির টাকা নিলে বিজ্ঞাপনদাতাদের মর্জিমাফিক নানা মিথ্যা বাজে কথা ছাপতে হয়। চাতুরীর সাহায্যে কাগজের বিক্রি বাড়ানো বা অন্য কাগজের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। তিনি সুযোগ্য সম্পাদক ছিলেন কিন্তু কখনও পত্র সম্পাদনা করে জীবিকা অর্জন করেননি।

ভারতে ফিরেও গান্ধী এই ধারা বজায় রেখে নিজ সর্তে কাগজ সম্পাদনা করেছিলেন। কোনও বিজ্ঞপ্তি না ছেপে ৩০ বছর কাগজ চালিয়েছিলেন। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র সম্পাদনার দায়িত্ব নেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জানিয়ে দেন যে কাগজ স্বাবলম্বী না হলে, লোকসান দিয়ে কাগজ চালাবেন না। ইংরেজী কাগজ দেশের জনসাধারণ পড়তে পারে না বলে ইংরেজী কাগজের সম্পাদনা করে তিনি তৃপ্ত হননি। তিনি দেশীয় ভাষায় কাগজ চালাতে উৎসুক ছিলেন তাই একযোগে ইংরেজীতে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' আর তার হিন্দী ও গুজরাতী সংস্করণ 'নবজীবন' সম্পাদনা করতেন, তিনটি ভাষাতেই লেখা লিখতেন। তাঁর নামকরা অনেক রচনা বা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ চলতি ট্রেণে লেখা হত। তাঁর ডানহাত ক্লান্ত অচল হয়ে পড়লে তিনি বাঁ হাতে কলম চালাতেন।

বহু কাজের মধ্যেও তিনি প্রতি কথা ও বাক্য বিচার করে, চিন্তা করে লিখতেন। পাঠকদের খুশী করার জন্য তিনি সাজিয়ে গুছিয়ে কিছু লিখতেন না। লাগসই শিরোনামা বেছে নেওয়ায় বা ভাষান্তর করায় তিনি বিশেষ পটু ছিলেন।

ভারতে কোনও কাগজ চালিয়ে তাঁর কখনও লোকসান হয়নি। তাঁর ইংরেজী ও দেশীয় ভাষার সাপ্তাহিকগুলির বিক্রি সংখ্যা ছিল ৪০,০০০; সরকারের বিরোধ করে লেখার ফলে তিনি জেলে বন্দী থাকাকালে সে সংখ্যা কমে ৩০০০-এ দাঁড়িয়েছিল। প্রথমবার ভারতের জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি গুজরাতী 'নবজীবন'-এ তাঁর আত্মকথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ধারাবাহিকভাবে তিন বছর সে আত্মকাহিনী ছাপা হয়েছিল। অন্যান্য পত্রিকাতেও গান্ধী ঐ লেখার অনুবাদ ছাপবার

অনুমতি দিয়েছিলেন। সর্বত্র তাঁর 'সত্যের প্রয়োগ'-এর খুব আদর হয়েছিল।

জেলে আটক অবস্থায় তিনি হিন্দীতে 'হরিজন' নামে আর একটা সাপ্তাহিক চালু করেন। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র মতো এর দামও মাত্র একআনা ছিল। অচ্ছুত হরিজনদের সেবা করা এর মূল উদ্দেশ্য ছিল। বহু বছর এ সাপ্তাহিকে রাজনীতির আলোচনা করা হয়নি। তিনি জেল থেকে হপ্তায় তিনবার লেখা পাঠাবার অনুমতি পেয়েছিলেন। যখন ইংরেজীতে 'হরিজন' ছাপাবার প্রস্তাব হয় তখন গান্ধী একজন উদ্যোক্তাকে লিখে-ছিলেন: "যদি ভাল কাগজ ও ভাল ছাপাইয়ের ব্যবস্থা না হয়, পড়ার যোগ্য লেখা সংগ্রহ করা এবং আমার হিন্দী লেখার ঠিকমতো তর্জমা করার বন্দোবস্ত না হয় তবে ইংরেজী সংস্করণ না ছাপানোই বাঞ্ছনীয়। বাজে ইংরেজী সংস্করণ বের করার চেয়ে কেবল হিন্দী সংস্করণ ছাপানো ঢের ভাল। কাগজ স্বাবলম্বী না হলে আমি তাতে হাত দেব না।" গান্ধী তিন মাসের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে হপ্তায় ১০,০০০ কপি ইংরেজী 'হরিজন' ছাপাতে রাজী হন। ছ'মাসের মধ্যে কাগজটি বিনা লোকসানে চলতে থাকে। ক্রমশঃ এটা খুব জনপ্রিয় বিশিষ্ট মতের কাগজ বলে গণ্য হয়। লোকে এ কাগজ পড়ে আমোদ পেত না, শিক্ষা পেত। 'হরিজন' পরে বাংলা, উর্দু, তামিল, তেলেগু, উড়িয়া, মারাঠী, গুজরাতী ও কন্নাড ভাষায় ছাপা হত। গান্ধী ইংরেজী, হিন্দী আর গুজরাতী সংস্করণের জন্য নিয়মিত লেখা লিখতেন। হপ্তার পর হপ্তা তিনি গঠনমূলক কাজ, কাতাই, খাদি, গ্রামোদ্যোগ, সত্যাগ্রহ, অহিংসা, খাদ্য, শিক্ষার হেরফের, প্রাকৃতিক চিকিৎসা, হিন্দুমুসলিম ঐক্য প্রভৃতি সম্পর্কে লিখতেন। ভারতের হাজার হাজার গ্রামের উন্নয়ন তাঁর ধ্যেয় ছিল। তিনি কাগজে যে প্রশ্ন-পেটিকা বিভাগ রেখেছিলেন তাতে পাঠকদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তিনি জাতীয় বদ অভ্যাসের কড়া সমালোচক ছিলেন। সমাজসংস্কারের জন্য বহু ত্রুটিবিচ্যুতির নিষ্ঠুর সমালোচনা করতেন এবং পুনরুক্তি ঘটেছে জেনেও বারংবার তাঁর কল্পিত

আদর্শমূলক গঠনকর্মের ফিরিস্তি দিতেন। তাঁর লেখা নীতিশিক্ষাপূর্ণ ছিল, পাঠকদের কাছে নানা কঠিন দাবি পেঁছে দিত তবু তাঁর লেখা পড়বার জন্য পাঠকরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করত।

গান্ধী প্রথম থেকেই খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে একজন সম্পাদক অন্যান্য কাগজ থেকে দরকারী খবর বেছে নেবার জন্য দৈনিক আধঘণ্টা সময় দেয় শুনে গান্ধী সবিস্ময়ে বলেছিলেন, "মাত্র আধঘণ্টা লাগে! 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন'-এর বদলে আমি সপ্তাহে ২০০ পত্রপত্রিকা পেতুম। প্রত্যেকটি কাগজ মন দিয়ে পড়ে যোগ্য খবর সংগ্রহ করতুম। এভাবেই সাংবাদিকের কাজ চালান উচিত।"

তিনি সহকারীদেরও খুব খাটাতেন। লেখায় সাহায্য করা ছাড়া তাদের রেল ও ডাকের সময় মুখস্থ রাখতে হত। চলন্ত ট্রেনে লেখা কোন্ স্টেশনে কখন ডাকে দিলে ঠিক সময়ে ছাপাখানায় পেঁছবে এ হিসেব সম্বন্ধে তাদের ওয়াকিফহাল থাকতে হত। রেলের কামরায় বহুলোকের ভীড় জমলে তাঁর সেক্রেটারিকে স্নানের ঘরে বসে কাজ মিটিয়ে রাখতে হত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গান্ধী 'হরিজন'এ যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন। 'হরিজন' পত্রিকার সকল সংস্করণগুলির ওপর সরকারী শাসনের পরোয়ানা জারি হয়েছিল। গান্ধী ওসব বিধিনিষেধ মেনে নিয়ে লিখতে অস্বীকার করে বলেছিলেন, "যদি আমার ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত হয় তবুও আমি আমার লেখনীর কণ্ঠরোধ করব না। আমি যদি অহিংসার প্রচার বন্ধ করি তো আমার সত্তাকে অস্বীকার করতে বাধ্য হব। এই নতুন হুকুমের কাছে নত হওয়া তারই নামান্তর হবে।" নিজপক্ষ সমর্থন করে তিনি আরো বলেছিলেন যে, "'হরিজন' তো সংবাদপত্র মাত্র নয়, মতামত প্রচারপত্র। খোশখবর পাবার জন্য লোকে এটা কেনে না, তাদের শিক্ষার জন্য এবং জীবনের চালচলন আচারব্যবহার দুরস্ত করার জন্য কেনে। 'হরিজন' কাগজ বন্ধ করা যেতে পারে কিন্তু যতদিন আমি

বেঁচে থাকব ততদিন তার বাণী প্রচারিত হবেই। সরকার 'হরিজন' বাজেয়াপ্ত করার আগে যেন একবার ভেবে দেখেন যে তাঁরা কিসের কণ্ঠরোধ করতে চাইছেন।" 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় 'হরিজন' ছাপাই বন্ধ ছিল।

সাংবাদিকদের হুজুগ তুলে লোকমাতাবার রীতির গান্ধী নিন্দা করতেন। গুজব রটিয়ে মানুষ ক্ষেপিয়ে তোলা তিনি বিশেষ অপছন্দ করতেন। কাগজে ছাপার হরফে যা কিছু লেখা হয় তাই বেদবাক্য মনে করে গালগল্প করাতেও তাঁর আপত্তি ছিল। স্বাধীনতার আগে কাগজে উত্তেজনাপূর্ণ খবর প্রচারের ঝোঁক দেখে তিনি উত্যক্ত হয়ে বলেছিলেন, "খবরের কাগজওয়ালারা মহামারীর রূপ নিয়েছে। কাগজ ক্রমশঃ মানুষের মনে বাইবেল, কোরান ও গীতার সমন্বয়স্বরূপ হয়ে উঠেছে। একটা কাগজে যেই লিখল দাঙ্গা বেধেছে অমনই দিল্লীর যত লাঠিছোরা বিক্রি হয়ে গেল আর সকলে ভয়ে বিবশ হয়ে পড়ল। জনগণকে ভীরু না করে সাহসী করাই সাংবাদিকের কর্তব্য।"

মুদ্রাকর প্রকাশক

গান্ধী কেবলমাত্র 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' 'ইয়ং ইণ্ডিয়া,' 'নবজীবন' এবং 'হরিজন'-এর সম্পাদক ছিলেন না, এ সব কাগজের মালিকানাস্বত্বও তাঁর ছিল। তিনি জানতেন যে অন্যের ছাপাখানায় তাঁর পত্রিকা ছাপালে নিজ স্বাধীন মতামত প্রকাশ করা যাবে না। যে কাগজের মূলধন অন্যে জোগায় বা যে কাগজ-ছাপা প্রেসের আলাদা মলিক থাকে সে কাগজে সাহস করে রাজশক্তির বিরুদ্ধ সমালোচনা ছাপতে চায় না। রাজসরকারের নিন্দা করলে, দোষ দেখালে, প্রেস আটক হয়ে যায়, জরিমানা হয়। গান্ধী সরকারের অবিচারের কথা খোলাখুলিভাবে লিখতে চাইতেন এবং যা সত্য তা নির্ভীকভাবে প্রচার করতে চাইতেন সেজন্য ভারতে 'নবজীবন প্রেস' স্থাপনা করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ফিনিক্স বসতিতেও তাঁর নিজ ছাপাখানা ছিল। সে ছাপাখানায় হাতে ছাপার হরফ সাজান হত এবং এক পুরানো তেলকলের সাহায্যে কাগজ ছাপা হত।

প্রথম রাতে 'ইণ্ডিয়ান্ ওপিনিয়ন' ছাপতে গিয়ে বিভ্রাট ঘটে, কলটা বিগড়ে যায়। সঙ্গীসাথীদের জাগিয়ে, তাদের সাহায্যে গান্ধী চাকাতে কাঁধ লাগিয়ে কয়েকঘণ্টা খেটে নির্দিষ্টসময়ে কাগজের ছাপাই শেষ করেছিলেন। যখনই এমন বিপদ ঘটত তখনও কাগজের সংখ্যাগুলি যথাকালে পাঠকদের কাছে পৌঁছে যেত।

গান্ধী যখন ছাপাখানাটা শহর থেকে দূরে ফিনিক্স বসতিতে সরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন তখন এক সহকর্মী ভেবেছিলেন এই খামখেয়ালের ফলে ক্ষতি হবে, ছাপাখানা উঠে যাবে। নিজের এবং সঙ্গীদের ছাপাই কাজের খুঁটিনাটি হাতেনাতে শেখার সুযোগ মিলবে জেনে গান্ধী তাঁর

সঙ্কল্প আঁকড়ে থাকেন। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' প্রতি শনিবার ছেপে বের হত। শুক্রবার দুপুরে সব লেখা হরফে সাজান হত, সন্ধ্যার সময় ছাপার কাজ শুরু হত। গান্ধী প্রায়ই শনিবার শেষরাত পর্যন্ত জেগে কাগজের পুরো কাজ মিটিয়ে ফেলতেন। তাঁর ও-ছাপাখানায় মাইনে-করা চাকর চাপরাসী ছিল না। কিশোরবয়স্ক ছেলেমেয়েরা এবং বয়স্থ আশ্রমবাসীরা কাগজ কাটা ভাঁজ করা আর ডাকটিকিট লাগাবার কাজের ভাগ নিত। দরকার পড়লে কস্তুরবা এবং অন্য মেয়েরা এ কাজে যোগ দিতেন।

ফিনিক্স বসতিতে গান্ধী প্রবন্ধ লিখতেন, ছাপার কাজের তদারক করতেন, কখনও বা ছাপার হরফ সাজাতেন। কাগজ ঠিক সময়মত বিলি হল কিনা তার প্রতি কড়া নজর রাখতেন। এভাবে তিনি কয়েকজন সঙ্গীকে ছাপার কাজে পটু কর্মী করে তুলেছিলেন। একদিনের জন্য কিশোররা 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' ছাপান ও বিলি করার পুরো ভার নিয়েছিল। তারা সারারাত জেগে অক্ষর সাজিয়েছিল, কাগজ ছেপে, কেটে, বাণ্ডিল বেঁধে তাকে পাঠিয়েছিল। সাপ্তাহিক ছাপান ছাড়া ফিনিক্স প্রেস ও নবজীবন প্রেস থেকে ইংরেজী, হিন্দী ও অন্য ভারতীয় ভাষায় শতাধিক বই ছাপিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। ভাল মজবুত কাগজ আর পরিচ্ছন্ন ছাপাইএর ওপর গান্ধী লক্ষ্য দিতেন। এই গরীব দেশে বেশী দামী বই অনেকে কিনতে পারবে না জেনে গান্ধী ছবিওলা, সুন্দর মলাটওলা বাহারে বই ছাপাতেন না। তাঁর জীবনকালে নবজীবন প্রেস থেকে যথাসম্ভব কমদামের বই প্রকাশিত হত। তিনি তাঁর দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা গুজরাতী ভাষার আত্মজীবনীর দাম মাত্র বারো আনা ধার্য করেছিলেন। খাদি ও কুটিরশিল্পের প্রচারের জন্য গঠনমূলক কাজ সম্পর্কীয় অনেক বই তিনি ছেপেছিলেন। ভারতের বড় বড় শহরে নবজীবন প্রেসের নিজস্ব বইয়ের দোকান ছিল। একলক্ষ টাকা দামের ছাপাখানাটা গান্ধী স্বদেশী প্রচার ও ভারতীয় ভাষা প্রচারের জন্য দান করেন। ঐ

ছাপাখানায় ইংরেজী, হিন্দু, গুজরাতী, মারাঠী প্রমুখ নানা ভাষায় বই ছাপা হত।

পাঠক ও মুদ্রাকরের কাজ সহজ করার উদ্দেশ্যে গান্ধী সারা ভারতে একটি বর্ণমালার প্রচলন করতে উৎসুক ছিলেন; এদেশে অধিকাংশ ভাষার জন্ম সংস্কৃত থেকে তাই তিনি দেবনাগরী অক্ষর বেছে নেবার পক্ষপাতী ছিলেন। 'গুজরাতী ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন'-এ হিন্দীতে তুলসী রামায়ণের বিজ্ঞপ্তি দেখা যায়। তাঁর অন্যান্য গঠনমূলক নূতন মতের মতো এ চেষ্টাও জনগণের সমর্থন পায়নি।

গান্ধী নিজের ছাপাখানায়, নিজের কাগজে, নিজ দায়িত্বে মতামত প্রকাশ করতেন। সরকার যখন আইনের কড়াকড়ি করত, নানা নিষেধ মেনে কাগজ ছাপতে বলত, তখন গান্ধী কাগজ ছাপা বন্ধ রাখতেন। ভারতে ইংরেজরাজের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন বলে সরকার দু'বার 'নবজীবন' ছাপাখানা ক্রোক করে আট-দশ বছরের পুরানো 'হরিজন'-এর রচনাসংগ্রহাদি তছনচ করে দিয়েছিল। তবু গান্ধী দমে যাননি। তিনি জামিন হিসেবে সরকারের কাছে টাকা জমা দেবার চেয়ে ছাপাখানা আটক হতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করতেন। তিনি বলতেন, "আমরা আপৎকালে সীসের হরফ ও যন্ত্রদেবতাকে বিসর্জন দিয়ে আমাদের কলম ও কর্মপটু হাত দিয়ে লেখা কাগজ বের করব, জনে জনে তা নকল করে প্রচার করব। মুখে মুখে সত্য খবর বিলোব। এভাবে প্রত্যেকে বিনামূল্যের সজীব খবরের কাগজে পরিণত হব। এ কাগজ তো সরকার বাজেয়াপ্ত করতে পারবে না।"

সরকার বাহাদুরের কড়া সমালোচনা করেছিলেন বলে সম্পাদক গান্ধী এবং সহকর্মী মুদ্রাকর গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। আদালতে জেরার জবাবে নিজেদের আইনের চোখে দোষী, বিদ্রোহী বলে স্বীকার করার ফলে দু'জনের কারাবাসের সাজা হয়।

লেখার ভাষা, ছাপার অক্ষর, সব কিছুর ওপর গান্ধীর নজর

থাকত। 'হরিজন' সাপ্তাহিকের হরফের মাপজোক ও মানানসই শিরোনামার অক্ষরের ঢঙ তিনি নিজে পছন্দ করেছিলেন। দু'আনা দামের পত্রিকা তিনি এক আনায় ছেপে বেচতে শুরু করেছিলেন। নিজের লেখার সর্বস্বত্ব সংরক্ষণে তিনি বিশ্বাস করতেন না। যখন তাঁর লেখার কোনও বিকৃতি ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিত তখন এ ব্যবস্থা মেনে নিতেন।

পরিচ্ছন্ন ছাপাই, টেকসই কাগজ এবং সাদাসিদে অথচ সুশ্রী বাঁধাই ও মলাটের ওপর তাঁর ঝোঁক ছিল। শিশুদের বই সম্পর্কেও তাঁর আগ্রহ ছিল। ছোটদের বই বড় বড় হরফে, ভাল কাগজে ছাপানো উচিত এবং প্রতি লেখার সঙ্গে উপযোগী নক্সা আঁকা থাকা দরকার এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। বেশী মোটা অনেকপাতার একটা বইয়ের বদলে তিনি ছোটদের জন্য পাতলা পুস্তিকা ছাপার পক্ষপাতী ছিলেন। চটি বই সহজে নাড়াচাড়া করা যায় আর শিশুমনকে ক্লান্ত করে না। শিশুপাঠ্য বই সম্বন্ধে গান্ধীর নির্দেশ স্মরণ রেখে আশ্রমের শিক্ষা-বিভাগের কর্তা একটি বই ছাপিয়েছিলেন। রঙীন ভাল কাগজে ছাপা বইটির পাতায় পাতায় ছবি ছিল, দাম ধার্য হয়েছিল মাত্র পাঁচ আনা। মনে একটু গর্বের ভাব নিয়ে তিনি গান্ধীকে শুধিয়ে-ছিলেন, "বাপুজী, আপনি বইটি দেখেছেন? ওর সমস্ত পরিকল্পনা আমার।" গান্ধী উত্তর করলেন, "হাঁা দেখেছি, অতি সুন্দর হয়েছে। কিন্তু ওটা কাদের জন্য করেছ?" এই পাঁচ আনা দামের বই কেনার মত অবস্থা দেশের ক'জন পাঠকের আছে বল তো? আধপেটা খেয়ে যে ছেলেপুলেরা থাকে তাদের শিক্ষার ভার তোমার উপর ন্যস্ত আছে। অন্য বই যদি এক আনায় বিক্রি হয় তো তোমার বইয়ের দাম হওয়া উচিত দু' পয়সা।" এই কথা শুনে লজ্জা পেয়ে সহকর্মীটি পরে সে বইয়ের পাঁচ পয়সার সংস্করণ ছেপে বের করেন।

মুদ্রাকর গান্ধী কিন্তু সব সময় কিপ্টেমী করতেন না। বাজে খেলো বই লোকের হাতে তুলে দিতেন না। একবার গোখলের

লেখাগুলি গুজরাতীতে অনুবাদ করে বের করার প্রস্তাব তিনি করেন। অন্যের ওপর তর্জমা করার ভার ছিল, গান্ধী শুধু ভূমিকা লেখার দায় নিয়েছিলেন। বই ছাপার পর ভূমিকা লিখিয়ে নেবার মানুষ যখন এল তখন গান্ধী তর্জমার খানিকটা পড়ে বললেন, "এ কি আড়ষ্ট ভাষা হয়েছে, সাধারণ লোকে বুঝবে কেমন করে? এ বই জ্বালিয়ে দাও।" ভদ্রলোক কাঁচুমাচু হয়ে জানালেন যে ওর জন্য সাতশো টাকা খরচা হয়ে গেছে। গান্ধী বললেন, "তা কি হবে। আরো টাকা খরচ করে মলাট দিয়ে বাঁধিয়ে এ ছাই ভস্ম লোকের হাতে তুলে দিতে হবে নাকি? মন্দ সাহিত্য লোককে পড়তে দিয়ে আমি তাদের রুচি নষ্ট করতে চাই না।" সে সব ছাপা কাগজ একেবারে উনুনে গেল, পুরানো কাগজ হিসেবেও গান্ধী তা বিক্রি করতে দিলেন না। মন্দ বই, মন্দ ছাপাই প্রকাশ করা তিনি হিংসা করার মতো অন্যায় মনে করতেন।

অভিনব রুচিকার

অন্য অন্য দেশে যারা মানুষের বেশবাসের রঙচঙ বদল করে, আসবাবের ছাঁদ এবং ঘরবাড়ী, সভা সাজাবার কায়দা বাতলে দেয় তাদের বলে রুচিকার, রসজ্ঞ কলাকার। তাদের বেশ খাতির আছে, আয়ও আছে। মৌলিকভাবে ফুলসাজ রচনা, চা-পান পর্বপালন ও গৃহসজ্জার জন্য জাপানের খ্যাতি আছে। খাতির বা টাকার লোভ না রেখে গান্ধী নিজ জীবনযাত্রা সরল সহজ সুন্দর করেছিলেন। প্রকৃত কলাবিদের মতো গান্ধীর রূপসন্ধানী দৃষ্টি ও নির্মল পরিচ্ছন্নতাবোধ ছিল। অল্প সহজ প্রাপ্য উপকরণ দিয়ে সংযত অথচ মর্যাদাময় পরিবেশ তিনি গড়ে তুলতে পারতেন, শুষ্ক রুক্ষতাকে ঢেকে দিতেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধী প্যাণ্টের সঙ্গে স্যাণ্ডাল ব্যবহার করা শুরু করেন। তখন এ একটা অভাবনীয় কাণ্ড ছিল। যে কোনও চলতি কুপ্রথাকে অগ্রাহ্য করার ব্যক্তিত্ব ও নিষ্ঠা তাঁর ছিল তাই চাপা চোস্ত-কাঠের জুতোর চেয়ে স্যাণ্ডাল পরলে গরমে পা আরাম পায় আবার শীতেও দরকার হলে মোজাসহ ঐ পাদুকা ব্যবহার করা যায় বলে তিনি ওটি বেছে নিয়েছিলেন। ঐ জুতো তিনি নিজে বানাতেও শিখেছিলেন। তাঁর দেখাদেখি জবরদস্ত শাসনকর্তা স্মাটস সাহেবও স্যাণ্ডাল পরেছিলেন। এভাবে গান্ধীর প্রচলিত কিছু কিছু রীতিপদ্ধতি আজও চালু আছে, কোন কোনটা জনমতের সমর্থন না পেয়ে লোপ পেয়ে গেছে।

ভারতে কংগ্রেসের বৈঠকে প্রথম যোগ দিয়ে তিনি লক্ষ্য করে-

ছিলেন যে শুধু ভিন্ন ভিন্ন জাতের জন্য নয়, প্রতিনিধি ও স্বেচ্ছাসেবক-দের ভিন্ন রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী আলাদা রান্নাঘরে আলাদা রান্না হচ্ছে। তিনি চিরদিন জীবনের ছোটখাটো কাজ ও রোজকার অভ্যা-সের কদর করতেন বলে তাঁর মনে হয়েছিল এ অব্যবস্থার ফলে কত সময়, অর্থ ও শক্তি নষ্ট হচ্ছে। এসব ভেদভাব বর্জন না করলে দেশ-বাসী সত্যি স্বরাজ লাভ করবে না এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। খাওয়ার জন্য সময়, অর্থ, সামর্থ্যের অপব্যয় বন্ধ করার উদ্দেশ্যে, জীবনে খাওয়া নিয়ে পরীক্ষা করে তিনি তাঁর আশ্রমে সাদাসিদে মশলাহীন অথচ পুষ্টিকর খাদ্যের চল্ করেছিলেন। একটা রান্নাঘরে ঢালাই নিরামিষ রান্না হত, একটা খাবার ঘরে বসে হিন্দু, মুসলিম, পার্শী, খৃষ্টান সেই খাবার খেত। গান্ধী কাঁচা সবজির স্যালাড, ফল, মেওয়া, সিদ্ধ তরিতরকারি, ঢেঁকি-ছাঁটা চাল, জাঁতা-ভাঙা আটার ব্যবহার করতেন। সাদা চিনির বদলে তাজা সোনালী গুড় বা মধুতে বেশী খাদ্যগুণ আছে প্রমাণ করে লোককে বাইরের চকমকানির বদলে সব জিনিসের আসল গুণের আদর করতে শেখাতেন।

ফৈজপুর গ্রামে কংগ্রেস অধিবেশনে প্রতিনিধি, অতিথি-অভ্যাগতদের হাত-কোটা চাল, হাতচাকিতে ভাঙা আটার রুটি খেতে দেওয়া হয়েছিল। গ্রামে গ্রাম্য মালমশলা—ঘাস, বাঁশ, কাঠ, মাটি, খাদি প্রভৃতি দিয়ে কংগ্রেস সভার চত্বর ও মণ্ডপ সাজাবার খেয়াল তাঁর মনে প্রথম জাগে। ইতিপূর্বে, ৫০ বছর ধরে কলকাতা মাদ্রাজ বম্বে জাতীয় বড় শহরে কংগ্রেস অধিবেশন হয়ে এসেছিল আর কেবল শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মানুষরা তাতে যোগ দিতেন। গান্ধী প্রথম কংগ্রেসকে লোকসভায় পরিণত করেন। তিনিই প্রথম সাধারণ মানুষের দেশী পোশাক পরে হিন্দীতে ভাষণ দিয়েছিলেন।

ফৈজপুরের তিলকনগরের পরিকল্পনার খুঁটিনাটি বিষয়ে গান্ধী পরামর্শ ও নির্দেশ দিয়েছিলেন। শিল্পী নন্দলাল বসু গান্ধীর স্বপ্ন সার্থক করে সহজপ্রাপ্য গ্রামীণ জিনিস দিয়ে, গ্রামের শিল্পী-মজুরের সাহায্যে এটির

বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন। শিবিরের ছাদ আর দেওয়াল চাঁচের বেড়া দিয়ে তৈরী হয়েছিল। রঙীন বাঁশের মাথায় ঝুড়ি-চুপড়ি উপুড় করে সাজিয়ে তোরণ গাঁথা হয়েছিল। তার ওপর যে জাতীয় পতাকা উড়েছিল তাও গান্ধীর সৃষ্টি। কয়েকবছর আগে তিনি এই পতাকার যে রূপ দেন তাতে স্থির হয় পতাকার তিনটি রঙ—কমলা, সাদা আর সবুজ—সমান্তরালভাবে সাজান থাকবে; সাদারঙের মাঝখানে জনগণ ও অহিংসার প্রতীক চরকার ছবি ঘননীল রঙে আঁকা থাকবে।

আমাদের সাদাসিদে অথচ ভব্য জাতীয় বেশের প্রবর্তন করার কৃতিত্বও গান্ধীর। বিশেষ প্রয়োজনে, চলতি মত উপেক্ষা করে গান্ধী বারবার নিজ পোশাকের হেরফের ঘটিয়েছিলেন। ভারতীয়দের নেতা হয়ে যখন গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ পরিচালনা করেছিলেন তখন তাঁর ফৌজে বেশীর ভাগ মা[illegible]জী মজুর সৈনিক ছিল। তাদের সঙ্গে সহানুভূতি দেখিয়ে, তাদের একজন হবার চেষ্টায় গান্ধী তাঁর সখের বিলিতী ছাঁটের কোট-প্যাণ্ট ছেড়ে সহসা লুঙ্গির মতো ধুতি আর কুর্তা পরেন, কাঁধে ঝোলা আর হাতে লাঠি তুলে নেন।

ভারতে ফিরে জন্মস্থান কাঠিয়াবাড়ের সাজে তিনি সাজলেন। ফতুয়া, কামিজ, লম্বাকোট, ধুতি আর জবড়জঙ পাগড়ির সমন্বয়ে সে সাজ ছিল জটিল। গরম দেশে ও-বেশ বড় অস্বস্তিকর তাছাড়া যে দেশে সবার পরনে কাপড় নেই সেখানে দশ বিশ হাত পাগড়ি বাঁধার জন্য অত কাপড় বরবাদ করা তাঁর মনঃপূত ছিল না। কাপড়ের বোঝা কমিয়ে তিনি শুধু ধুতি, কামিজ আর টুপি পরে নামী সভায় যেতে শুরু করলেন, তাই দেখে ভদ্দরলোকেরা থ। কেউ বা অবাক চোখে চাইত, কেউ উপহাসের হাসি হাসত। গান্ধী থাকতেন নির্বিকার। কাতাই-বোনাই শেখার পর তিনি শুধু খদ্দর ব্যবহার করতেন। শীঘ্র গান্ধীটুপির জন্ম ঘটল। রোদ বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাবার জন্য সাহেবী সোলাটুপি সবচেয়ে ভাল মনে করলেও ধুতির সঙ্গে তা অচল বুঝে কাশ্মীরীঢঙের সাদা খাদি টুপি তিনি বেছে নিলেন। মুসলিমদের চিকনের কাজকরা

টুপি বাহার বাড়ায়, মারাঠা হিন্দুস্থানীর শক্ত টুপি বিদেশী জিনিসে তৈরী তাই তারা ঠাঁই পেল না গান্ধীর মাথায়। সাদা টুপি সহজে তেলময়লা লেগে মলিন হয়ে যায় বলে অনেকে অনুযোগ করেছিল। গান্ধী বলেছিলেন, "ঠিক ঐ কারণেই আমি সাদা রঙ বেছে নিয়েছি। গাঢ়রঙের টুপি নোংরা হবে অথচ বোঝা যাবে না। তার নাম প্রকৃত পরিচ্ছন্নতা নয়। খদ্দরের নরম টুপি অনায়াসে কেচে শুখিয়ে নেওয়া যায়, খুলে পকেটে রাখা যায়।" ধীরে ধীরে গান্ধীটুপি আদরের ও গর্বের বস্তু হয়ে পড়ে। স্বদেশী যুগে গান্ধীটুপি-পরা ছাত্রদের রাজভক্ত শিক্ষকরা জরিমানা করতেন, সাজা দিতেন।

স্বেচ্ছাসেবকদের মাথায় এ টুপি দেখে পুলিস ক্ষেপে উঠে তাঁদের মারত, টান্ মেরে টুপি খুলে ফেলে দিত। কত মারোয়াড়ী, রাজস্থানী, গুজরাতী বিরাট পাগড়ি ছেড়ে, কত মুসলিম ফেজ সরিয়ে গান্ধীটুপি পরে ছিলেন। শিরোস্ত্রাণে অনভ্যস্থ বাঙালী, মাদ্রাজী, ওড়িয়ারা এ টুপি মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। গান্ধী স্বল্পকালের জন্য এ টুপি মাথায় দিয়েছেলেন। জনপ্রিয় খাদি-ধুতি বা পায়জামা, কামিজ আর গান্ধীটুপি জাতীয় পোশাকে পরিণত হয়েছিল।

যখন গান্ধী বিহারে চাষীদের হয়ে লড়ছিলেন তখন তাঁর পরামর্শমতো কস্তুরবা চাষীর মেয়েদের সাফাই শেখাতেন। একজন একদিন চটেমটে বললে, "গান্ধীজী কেবল আমাদের ফর্সা কাপড় পরতে বলেন। আমাদের এই তো একটি শাড়ী—কী বা পরব আর কী বা কাচব?" কস্তুরবার মুখে এ খবর শুনে গান্ধীর মনে ঘা লাগল। তখনই কিছু না করলেও নালিশটা মনে গেঁথে রইল। বছর পাঁচেক পরে তিনি খাদি ধুতি, পাঞ্জাবী আর টুপি পরে দেশকে স্বাধীন স্বাবলম্বী করার জন্যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার ক'মাস পরেই হঠাৎ বললেন, "যতদিন না আমার স্বাধীন দেশে সব মানুষের পরার যোগ্য যথেষ্ট কাপড় জুটবে ততদিন আমি শুধু কপনিচাদর পরব।" সেদিন থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ২৮ বছর গান্ধী ঐ বেশ সম্বল করেছিলেন। ইউরোপ ও বিলেতে তিনি

ঐ পোশাকে ঘুরেছিলেন, রোমা রোঁলা, ভারত সম্রাট, মন্ত্রীশাস্ত্রীর সঙ্গে ঐ বেশেই দেখা করেছিলেন। এর আগে পরে কেউ কখনও অমন বেশে ইংরেজ রাজবাড়ীতে বা মন্ত্রণাগৃহে যাননি। গান্ধীর সঙ্গীসাথীরাও ধুতি-কুর্তা চপ্পল পরে বিলেতে চলাফেরা করেছিলেন। ছাত্র অবস্থায় ১৯ শতকে যখন গান্ধী বিলেতে ছিলেন তখন ধুতি পরলে সাজা হত।

বিলেতের জাঁদরেল মন্ত্রী চার্চিল সাহেব গান্ধীর স্বদেশী হাঙ্গামায় উত্যক্ত হয়ে গান্ধীকে "আধ-নেংটা ফকির" বলে উপহাস করেছিলেন। এই আধ-নেংটা ফকিরের দেখাদেখি দেশের মতিলাল, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ অনেক বিলাসী মানুষ সাজ আড়ম্বর কমিয়ে মোটা খদ্দর পরতে শিখে-ছিলেন। কোঁচান ধুতি, গিলে-করা পাঞ্জাবী আর চুনোট-করা চাদর ব্যবহারে অভ্যস্থ বাঙালী বাবুরা খাদিধারী হয়েছিলেন।

গান্ধী সাদাসিদে চালচলনের পক্ষপাতী হলেও বেঢপ পোশাক, মালিন্য ও আলুথালুভাব সইতে পারতেন না। মাড় দেওয়া ইস্ত্রি করা বেশ ত্যাগ করলেও কখনও নোংরা, দাগলাগা, মোচড়ান চাদর কাপড় ব্যবহার করতেন না। ঘরে বাইরে তাঁর বেশ ছিল এক।

অর্থকে তুচ্ছ করলেও গান্ধী অর্থের অপব্যয় অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। লোককে চমক্ লাগিয়ে দেবার জন্য, খরচা করে আলো, রাঙতা, রঙীন কাগজের মালা, ফুলের হার দিয়ে সভামণ্ডপ সাজাবার চলনের তিনি বিরোধী ছিলেন। অল্পখরচে খেটেখুটে কেমন সুন্দরভাবে মণ্ডপ সাজানো যায় সে পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, "ফুলসাজ বা ফুলমালার জন্য টাকা নষ্ট করো না। তার বদলে সুতোর মালা ব্যবহার করা চলে। গিঁট বেঁধে সুতো জখম করার দরকার নেই। ফালতু অকেজো খাদির টুকরো দিয়ে পতাকা ও গুচ্ছ তৈরী করা যায়। মানপত্র না ছাপিয়ে হাতে তৈরী দেশী কাগজে সুছাঁদ অক্ষরে লেখা যায় —সে মানপত্র সুন্দরভাবে একখণ্ড খাদির কাপড়ে সেলাই করে দেওয়া যায়। ছোট ছেলেমেয়েরা খাদির কাপড়ে বক্তব্য ছুঁচের ফোঁড় তুলে, নক্সা কেটে লিখেও দিতে পারে।"

আশ্রমে সাদাকালো রঙের মানুষ, ব্রাহ্মণ অন্ত্যজ, হিন্দুমুসলিম, স্ত্রীপুরুষ, ধনকুবের ও দীনদুঃখী এক ধরনের খাবার খেয়ে থাকত। তিনি মাথার কাজের সঙ্গে হাতের কাজ জুড়ে দিয়েছিলেন, সর্বধর্মের সুভাষিত বচন উচ্চারণ করে প্রার্থনা করতেন।

সেবাগ্রামের এই সাধক রাজনীতিবিদের কাছে বহু বিদেশী নামী কবিশিল্পী, ধর্মগুরু, কূটনীতিজ্ঞ, মন্ত্রী, রাজদূত, সাংবাদিক আসতেন। গান্ধী তাঁর মেটে ঘরে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে দেশবিদেশের মান্য অতিথিদের স্বাগত জানাতেন। কখনও বা দেশের স্বরূপ দেখাবার জন্য গোপনে তাঁদের স্টেশন থেকে আশ্রমে আনাতেন। আশ্রমে ঢেঁকিছাঁটা চালের ভাত, সিদ্ধসবজি খেতে দিতেন।

পরদেশীরা মেঝেতে পা-মুড়ে বসে জননায়কের সঙ্গে গুরুগম্ভীর সমস্যা আলোচনা করত। সজ্জন গৃহস্বামীর মতো অতিথিপরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও ধনী কেতাদুরস্ত সাহেব-মেমদের, বিদেশীদের গ্রামীণ সরল আতিথ্য দেখিয়ে আপ্যায়ন করতে গান্ধী কুণ্ঠিত হতেন না। জরুরী বৈঠকে যোগ দেবার ডাক পেয়ে তিনি কতবার লাটবড়লাট, বিদেশী রাজদূতের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য তাঁর গ্রামের কুটির থেকে সিমলেদিল্লী গিয়েছিলেন। দেশের মানুষদের সঙ্গে নিবিড় যোগ রাখার জন্য বারবার সারা ভারত ঘুরেছিলেন। এ সব যাত্রা তিনি রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে সেরেছিলেন, কখনও উড়োজাহাজে চড়ে পাড়ি দেননি। দেশ স্বাধীন হবার আগে অন্য নেতারাও এ দৃষ্টান্ত অনুকরণ করেছিলেন। একটা জাতির, বিশেষ এক দরিদ্র দেশের, মানসম্ভ্রম কেবল সাজানো আড়ম্বর-বাহুল্য দিয়ে বজায় রাখা যায় এমন মিথ্যায় তাঁর আস্থা ছিল না। বরং সাজ-আড়ম্বরের খোলসে দারিদ্র্য গোপনের ব্যর্থ চেষ্টা, মিছে মানের বড়াই তাঁকে পীড়া দিত। দেশের নেতারা আহারেবিহারে জনগণের সত্য প্রতিনিধি হোন এই তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি দেশ শাসনের, রাষ্ট্রচালনার বিধির আমূল পরিবর্তন ঘটাতে চেয়ে বলেছিলেন, "গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে চাষী হবে

শাসনকর্তা। একজন চাষী-প্রধানমন্ত্রীর বাসের জন্য প্রাসাদ লাগবে না। তিনি মাটির ঘরে থাকবেন, খোলা আকাশের নীচে শোবেন আর অবসর পেলেই মাঠে কাজ করবেন।"

গান্ধী চেয়ারটেবিলে বসা শ'দুশো শিক্ষিত মার্জিত নেতার আবেদন-নিবেদন পেশ করার বার্ষিক কংগ্রেস অধিবেশনকে জনগণের বৈঠকে পরিণত করেন। রাষ্ট্রভাষায় এবং সরলভাষায় বক্তৃতা দেবার রীতি চালু করেন। বড়িপাঁচন, ছুরিকাঁচির যথাসাধ্য কম শরণ নিয়ে প্রকৃতির জলবায়ু রৌদ্র সেবনের উপকারিতা প্রচার করেন। সংবাদপত্র পরিচালনার ব্যাপারেও তিনি পথিকৃৎ ছিলেন।

গান্ধী জানতেন যে যাঁরা কায়দাবিলাসের মধ্যে মানুষ হয়েছেন তাঁরা এ সব দুঃসাহসী পরিকল্পনাকে কাজে লাগাতে অক্ষম তাই শিশুদের নতুন ধরণে শিক্ষা দিয়ে নতুন সমাজব্যবস্থার গোড়াপত্তন করতে চেয়েছিলেন। বুনিয়াদী শিক্ষা মারফত শিশুমন এমনভাবে গড়তে চেয়েছিলেন যাতে পড়ুয়ার মনে প্রকৃত জ্ঞানের আলো জ্বলে ওঠে, সে শুধু লেখাপড়ার কদর না করে কারিগরি কাজের মাধ্যমে শিক্ষিত হয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়, দেহমনে শক্ত হয়। তাদের মনে সর্বধর্মে সহিষ্ণুতা, সর্বজাতিতে প্রেম ও সকল কাজের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগিয়ে নতুন বিশ্বনাগরিক গড়ে তুলতে ব্যগ্র ছিলেন।

গান্ধী এক নতুন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নতুন ঢঙে লড়াই করায় পটু হয়ে ওঠেন। প্রতাপশালী মহামহিম শাসকশোষকদের জুলুম রদ করার জন্য অহিংস অসহযোগ গণ আন্দোলনের প্রবর্তন করেন। প্রহ্লাদ, যীশু প্রভৃতি একক মানুষের ঐ অস্ত্র ব্যবহার করার বিধি তিনি প্রথম রাজনীতিক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করে সফল হন। "আণবিক বোমা কি আপনার অহিংসায় বিশ্বাস টলিয়ে দেয়নি?" এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "না। সত্য ও অহিংসার প্রয়োগে সবচেয়ে বেশী বীর্য লাগে, এদের যুগ্মশক্তির বিরুদ্ধে আণবিক বোমার মার নিষ্ফল। আণবিক বোমা তো অহিংসাকে মুছে দিতে পারে না।" ভারতের বিপুল

জনসংখ্যার শক্তি একমুখী করে সঙ্ঘবদ্ধ করায় গান্ধীর দান অতুলনীয়। ভারতের অহিংস লড়াইয়ের দৃষ্টান্ত এশিয়া, আমেরিকা আফ্রিকার কত নিপীড়িত জাতির সামনে ধ্রুবতারা হয়ে বিনা রক্তপাতে পশুবলে বলীয়ান শাসকের কবল থেকে মুক্ত হবার পথ দেখিয়েছে।

গান্ধী নিজের রসবোধ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাঁর এক মেম-বান্ধবী রুক্ষ কাঠের মেঝে ও চৌকাঠ ঢাকবার জন্য গালিচা ও লেসের পর্দা ব্যবহার করতে ব্যগ্র হয়ে পড়েন। গান্ধী সবিস্ময়ে বলেছিলেন, "তুমি পর্দার আবরণ চাইছ কেন? জানলার ফাঁক দিয়ে যে উদার আকাশ, শ্যামল মাঠ, গাছপালা, সূর্যাস্ত দেখতে পাও তাকে পর্দা দিয়ে আড়াল করতে চাইছ কেন? বাজে অদরকারী বোঝায় ঘরদোর ভরে ফেলা এক রোগে দাঁড়িয়েছে। মোটা গালচে আর পঞ্চাশ রকমের চীনে মাটির তৈজস-সজ্জা সাফ রাখার জন্য দাসদাসী না রেখে ও-জঞ্জাল দূর করে দেওয়া ভাল।"

মাদ্রাজে ধনী বণিকের অট্টালিকায় আতিথ্য নিয়ে পাঁচমিশেলী জিনিসে সাজান বৈঠকখানা দেখে ক্ষুব্ধ গান্ধী বলেছিলেন, "তোমাদের আঁসবাবের চাপে আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কতকগুলো ছবি এমন কদর্য। আমাকে যদি চেট্টিনাদের প্রাসাদগুলি সাজাবার ভার দাও তো আমি এর দশভাগের একভাগ খরচে এমন ভাবে ঘর সাজিয়ে দেব যাতে ঘরে বাতাস খেলবে, মনে স্বস্তি জাগবে। আমার রুচিময় সজ্জা দেখিয়ে আমি ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র জোগাড় করতে পারব।"

গান্ধীর এ অহঙ্কার করা সাজত। চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু সেবা-গ্রামের গান্ধীকুটির দেখে বলেছিলেন, "ঘরের মেঝে আর দেওয়াল গোবর দিয়ে লেপা। সে ঘরে কোনও চিত্র, ছবি, মূর্তি, পুতুল ছিল না। বসার জন্য ঘরের এককোণে খদ্দরঢাকা মাদুর ও তাকিয়া ছিল। লেখার

কাজের জন্য ব্যবহৃত খদ্দরমোড়া কাঠের বাক্সের একধারে ঝক্‌ঝকে কাঁসার একটা ঘটির মুখে বটপত্রের আকারের লোহার ঢাকন- চাপা ছিল। স্বচ্ছতা, পরিচ্ছন্নতা এবং শান্ত সৌন্দর্যে ঘরটি ছেয়ে ছিল। তাঁর কোমর ঘিরে একখণ্ড খাদিকাপড় জড়ান, মুখে সর্বদা স্মিতহাসি খেলছিল। আমার চোখে সে মূর্তি হিংস্রতা ছাড়া সর্বগুণে গুণময় খুব ভাল ইস্পাতের তৈরী খাপখোলা তলোয়ারের মতো ঝলমল করছিল।"

সৌখিন সাপুড়ে

বালকবয়সে গান্ধী সাপকে বড় ভয় করতেন। রাতের আঁধার নামলে একা ঘরের বাইরে যেতে তাঁর সাহস হত না, গা ছমছম করত ; মনে হত আঁধারে গায়ে গায়ে, এপাশে ওপাশে ভূতপেত্নী, দৈত্যদানা, চোর-ডাকাত, সাপখোপ মিশিয়ে আছে, তিনি ঘরের বার হলেই তাঁর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। বেঘোরে প্রাণটা যাবে।

বড় হয়ে গান্ধী আশ্রম বেঁধে আধা-সাধুর জীবন কাটাতেন। আশ্রম মানে শুধু মাথা গোঁজার কুটির নয়—চাষবাসের জমি, ফলফসল ফলাবার বাগান, পড়ার পাঠশালা, জলের কুয়ো। শহরে শান্ত নির্জন ঠাঁই মেলে না তাই গান্ধী গ্রামে বাস করতেন। ভাল জমি কেনার টাকা তাঁর ছিল না তাই কম দামী পতিত জমি কিনে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিনিক্স বসতি, টলস্টয়বাড়ী আর ভারতে সবরমতী ও ওয়ার্ধা আশ্রম বেঁধেছিলেন। এসব জায়গাতেই সাপের বড় উপদ্রব ছিল। কখনও দেখা যেত খামারের চালে সাপ ঝুলছে, কখনও জোড়মানিক নাগনাগিণী কোন কর্মীর সাইকেলের পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে। কখনও শোবার ঘরেও তারা ঢুকে পড়ত। ছোট ছেলেপুলে নিয়ে এভাবে সাপের সঙ্গে বাস করা কঠিন অথচ সাপেদের নিয়ে কি করা যায় এ এক সমস্যা হল।

গান্ধীর নানা বাতিকের মধ্যে একটা বাতিক ছিল যে সাপ মারা হবে না। তিনি যে পরম বৈষ্ণব বংশের সন্তান, অহিংসায় বিশ্বাসী। নিজের বা স্ত্রীপুত্রের প্রাণ বাঁচাবার জন্য মাছমাংসডিম ব্যবহার করেননি, গয়লারা গাইমহিষীকে কষ্ট দিয়ে দুধের শেষ ফোঁটাটি পর্যন্ত দুয়ে নেয় বলে দুধ খাওয়া ছেড়েছিলেন। প্রাণীর দেহের অংশ দিয়ে তৈরী বা

জীবকে কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করা ওষুধ, টিকে, ইনজেকসান নিতেন না। সাপও ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব, তাকে কেমন করে মারা হবে। তাঁর সঙ্গী সাকরেদরা এ যুক্তি শুনে হতভম্ব। ঘরে সাপ ঢুকলে কি করা হবে? দড়ির সাপধরা ফাঁদ বানানো হলো তাই দিয়ে সাপ ধরে দূরে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু যখন ধরা যাবে না তখন? সাপের কাছে গিয়ে তাকে ধরার সাহস সকলের নেই তো। যদি কোনমতেই বিষাক্ত সাপ তাড়ান না যায় তো সঙ্গীরা সাপ মারতে পাবে এই ব্যবস্থা হল। এ বিধির কচিৎ কদাচিৎ প্রয়োগ ঘটেছিল।

একদম হিংসা না করে বাঁচা কঠিন তা গান্ধীর অজানা ছিল না। শাকসবজি ফল খাওয়া মানে গাছপালার প্রতি হিংসা করা। যে সব বাঁদর পাখীপোকারা ফসল খেয়ে ক্ষেত উজাড় করে দেয় অন্য কোনমতে তাদের তাড়াতে না পারলে তাদের মেরে ফেলায় গান্ধী নিমরাজী হয়েছিলেন। প্লেগরোগের মড়কের সময় রোগবাহী ইঁদুর আর বীজাণু ধ্বংস করার পরামর্শও দিয়েছিলেন। তবু সাপমারার সমর্থক ছিলেন না।

গান্ধী ও তাঁর সঙ্গীদের মনে আর এক প্রশ্ন উঠল। কোনটা বিষাক্ত জাত সাপ আর কোনটা নির্বিষ ঢোঁড়া তা কি করে চেনা যাবে? সবাই সাপুড়ে নয়, সাপের জাত চেনে না। গান্ধী সহজে হার মানার পাত্র ছিলেন না। সাপের ইতিকথা পড়তে লেগে গেলেন। কলেনবাক্ নামে তাঁর এক প্রিয় জার্মান বন্ধু ছিলেন। তিনি গান্ধীর সব খেয়ালে ভাগ নিতেন। রামের ভক্তবন্ধু ছিল হনুমান। গান্ধীভাইয়ের এই ভক্তবন্ধুকে সবাই আদর করে ডাকত "হনুমানজী"। কলেনবাক্ গান্ধীকে সাপের জাত চিনতে শেখালেন। সামনে রেখে লক্ষ্য করার জন্য আর সাপের সঙ্গে মিতালি করার জন্য কলেনবাক্ সাহেব এক কেউটে সাপ ধরে খাঁচায় রাখলেন। তাকে পোষ মানাবার জন্য নিজে হাতে খাবার দিতেন। হুকুম হল কেউ যেন কেউটেরাজকে জ্বালাতন না করে। আশ্রমের শিশুরা মহাখুশী; তারা খাঁচার পাশে জটলা করে সাপ কি খায়, কি করে দেখতে লাগল।

গান্ধী এক ফেঁকড়া তুললেন। কলেনবাক্‌কে বললেন, "তুমি সাপের চালচলন লক্ষ্য করার জন্য ওর সঙ্গে ভাব করছ। আমাদের কারো মনেই ওর প্রতি ভালবাসা নেই, সকলের মনে কৌতূহল আছে, ভয় আছে। জীবজন্তুরা ভয়ভালবাসার তফাত সহজে বুঝতে পারে। যতক্ষণ না আমাদের সাপের গায়ে হাত দেবার সাহস হবে ততক্ষণ আমাদের অহিংসার পরীক্ষা সফল হবে না। আমরা ওর বন্ধু হতে পারব না।" সে সাপেরও বোধহয় মানুষের সঙ্গে ভাব করার আগ্রহ ছিল না, মানুষদের ভয়ও করত। এক সকালে দেখা গেল খাঁচার দরজা খোলা আর সাপমশাই নিখোঁজ।

আর এক জার্মান আশ্রমবাসী সাপের বাচ্চা ধরে হাতের তেলোতে খেলাতে পারত। তার মনে একটুও ভয় ছিল না। সাপ নিয়ে এভাবে নাড়াচাড়া করার দৃষ্টান্ত দেখে অন্যদের মনে ভয় একটু কমল। সাপ শুনলেই তাদের আঁতকে উঠে দাঁতকপাটি লাগত। গান্ধীর মনে স্বস্তি ছিল না। তিনি ভাবতেন, "আমার কবে কি করে অমন সাহস হবে। তিনি অহিংসা ও নির্ভীকতার এমন স্তরে উঠতে চাইতেন যাতে তাঁর স্পর্শ থেকে সাপ বুঝতে পারবে যে তিনি তাকে আঘাত করতে চান না। মুখে রামনাম উচ্চারণ করতে করতে সাপের মুখে হাত দিতে পারা তিনি খুব বাহাদুরির প্রকাশ বলে গণ্য করতেন। সে সাহস তাঁর কোনদিনই হয়নি বলে গান্ধী লজ্জা পেতেন।

গুরুগম্ভীর সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকাকালেও তাঁর মনে সর্পতত্ত্ব জানার সখ চিরজাগরূক ছিল। একদিন দেশের নেতারা ওয়ার্ধা আশ্রমে তাঁর পরামর্শ নিতে গিয়ে দেখেন যে গান্ধীর গলা ঘিরে একটা সাপ ঝুলছে আর তিনি এক সাপুড়ের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছেন। সবাই অবাক ও ভয়ে শশব্যস্ত। কি ব্যাপার? গান্ধী তার কাছ থেকে সাপধরা আর সাপের বিষ কাটাবার কায়দা শিখে নিতে চান। ওঝা বলল, "একজনকে সাপে কামড়ালে তবে বিষঝাড়া দেখাতে পারি।" কে সাপের কামড় খাবে? গান্ধী বললেন, "আমি আমি।" সাথীদের মাথা নড়ে উঠল। অমন

দামী প্রাণ নিয়ে খেলা করায় তাঁরা বাধা দিলেন। গান্ধীরও ৭০ বছর বয়সে সাপুড়ের চেলা হবার সুযোগ মাটি হয়ে গেল, ওঝার বিদ্যে শেখা হল না।

এ ঘটনার এক যুগ আগে গান্ধী জেলে বন্দী ছিলেন তখন তাঁর দাঁতের যন্ত্রণা চলছিল, মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ছিল। এক নিগ্রো কয়েদী জেলে গান্ধীর ফরমাশী কাজ করে দিত। গান্ধী তার ভাষা জানতেন না, সেও গান্ধীর কথা বুঝত না, ইশারা ইঙ্গিতে কাজ চলত। সে একদিন হাঁউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে এসে হাজির। গান্ধী শুধোলেন, "কি হয়েছে?" সে জানাল তার আঙুলে বিসে কামড়েছে, বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। গান্ধী তখনই জেল হাসপাতালে খবর পাঠালেন, দেরি হলে ক্ষতি হবে ভেবে একটা ছুরি চেয়ে পাঠালেন। ক্ষতস্থান চিরে বিষাক্ত রক্ত বের করে দিলে প্রাণের ভয় থাকে না। ছুরি এল, তার নোংরা মূর্তি দেখে গান্ধী তা স্পর্শও করলেন না। আর দ্বিধা না করে তিনি ক্ষতস্থান ধুয়ে নিয়ে চুষতে লাগলেন। কিছুটা বদরক্ত চুষে ফেলে দেবার পর যখন নিগ্রোটি আরাম বোধ করতে থাকল তখন তিনি শুশ্রূষায় ক্ষান্ত দিলেন। রুগ্ন দাঁত দিয়ে বিষ ঢুকলে নিজের ক্ষতি হবে জেনেও নিগ্রোর কাতর কান্না সইতে না পেরে তিনি এ কাজ করেছিলেন। গান্ধী জানতেন অনেক সময় সাপের বিষে মানুষ মরে না, মরে ভয়ে।

অন্য অনেক ভয়ের মতো তিনি মানুষের মন থেকে সাপের ভয়ও ঘোচাতে চেয়েছিলেন। সবিষ ও নির্বিষ সাপ সম্বন্ধে জ্ঞান দেবার জন্যে তিনি বহুবার তাঁর সাপ্তাহিকে সচিত্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি বলতেন, "শতকরা ৯০ ভাগ সাপের বিষ থাকে না। অনেক সময় নির্বিষ সাপে কামড়ালেও ভয়ে মানুষ মারা যায়। আমাদের সাপচেনার সাধারণ জ্ঞান থাকা দরকার। বেশীর ভাগ সাপ নিরীহ, সবিষ সাপও আঘাত না পেলে বা তাড়া না খেলে কামড়ায় না। সাপেরা মানুষের উপকারও করে। তারা যে চাষীর পরম বন্ধু এ কথা আমরা ভুলে যাই,

গ্রামবাসীরাও জানে না। আমরা সাপ দেখলেই মারি। ইঁদুর এবং পোকামাকড়ে আবাদী জমির ফসল নষ্ট করে, সাপেরা তাদের ধ্বংস করে, ফসল বাঁচায়। সাপেরা শস্যক্ষেত্রে প্রহরীর কাজ করে তাই আমাদের পণ্ডিতরা তাদের আর এক নাম দিয়ে গেছেন "ক্ষেত্রপাল"—ক্ষেতের পালক, রক্ষাকর্তা। আমরা যাতে সাপকে হিংসা না করি সেজন্য কত ব্রতনিয়ম আছে। নাগপঞ্চমীর দিন মায়েরা সাপকে দুধ খেতে দেন। আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শেষশয়ান। তিনি নির্ভয়ে সাপের ওপর শুয়ে আছেন আর নাগরাজ বাসুকি তাঁর মাথার ওপর সাতটা ফণা হেলিয়ে রেখেছে। ভগবানের চোখে সাপ ভয়ঙ্কর নয়।"

একদিন সেবাগ্রামে গান্ধীর কুঁড়েঘরের সামনে কয়েকটি আধাউলঙ্গ চাষীর ছেলেকে জটলা করতে দেখা যায়। বড় কাঁচের বোতলে একটা সাপ ভরা ছিল, তারা অবাকচোখে সেটা দেখছিল। সাপটা ধরা পড়ার পর গান্ধী একজন ডাক্তারের কাছে সেটা পাঠিয়ে দেন। করেতজাতীয় বিষাক্ত সাপ দেখে ডাক্তার তার মাথায় ঘা মেরে মরে গেছে ভেবে ফেরত পাঠিয়ে দেন। সাপ, বিছে সহজে মরে না ও-সাপটার মেরুদণ্ড অক্ষত ছিল, মাথা ছেঁচে গিছল তাই অসাড় হয়ে পড়েছিল, মরেনি। তিনদিন ঐ অবস্থায় বেঁচে ছিল। কষ্ট থেকে মুক্তি দেবার জন্য তাকে জলে চুবিয়ে মারার পর একটা স্পিরিটের বোতলে পুরে গ্রামবাসীদের দেখাবার জন্য গান্ধী রেখে দিয়েছিলেন। গান্ধীর মনে গ্রামবাসীদের সাপ সম্পর্কে জ্ঞান জন্মিয়ে দেবার ইচ্ছা ছিল। সাপের জাত চেনাবার জন্য গান্ধী আশ্রমে জ্যান্ত সাপ ধরে রাখার খাঁচা বানিয়েছিলেন। সাপকে যাতনা না দিয়ে ফাঁদে আটকাবার কৌশলও তাঁরা জানতেন।

গান্ধী একদা তাঁর জ্ঞানী সাধক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, যে সত্যের সন্ধানী তাকে যদি সাপে তাড়া করে তো সে কি করবে? বন্ধু বলেছিলেন, "সে সাপকে আঘাত করবে না।"

গান্ধী ক্ষেত্রপালদের হিংসা করতেন না, তারাও আশ্রমে ঘোরাঘুরি করলেও কারো প্রাণের হানি ঘটায়নি। গান্ধীকেও সাপেরা কয়েকবার

শীতল স্নেহস্পর্শ দিয়েছিল কিন্তু কামড় দেয়নি। তিনি এক শীতের সন্ধ্যায় দাওয়ায় বসে গল্প করছেন এমন সময় একটা সাপ তাঁর পিঠ বেয়ে উঠে কাঁধের চাদরের ওপর ফণা দোলাতে লেগেছিল। তাঁর সঙ্গী গান্ধীকে সাবধান করাতে গান্ধী বলে ছিলেন, "আমি একটুও ভয় পাইনি, আপনি ব্যস্ত হবেন না।" ভদ্রলোক সাবধানে চাদর ঝাড়া দিয়ে সাপটাকে ফেলে দেন। আর এক দুপুরে শুয়ে থাকা অবস্থায় গান্ধীর বুকে একটা সাপ উঠেছিল। গান্ধী ভয়ে আত্মহারা হননি, চেঁচামেচি করেননি বা সাপটাকে ঘাবড়িয়ে দেননি। সে সুড়সুড় করে চলে গিয়েছিল। আরো একবার তিনি হাসপাতালে থাকাকালে এক শিক্ষিত আধুনিক সাপুড়ে সাপ পোষ মানাবার কৌশল কেরামতি দেখাবার জন্য আসে। একবাক্স চিত্তিরবিচিত্তির সাপ এনে সে গান্ধীর বিছানায় ছেড়ে দেয়। গান্ধী হাতপা স্থিরনিশ্চল রেখে নিবিষ্ট মনে তাঁর কম্বলের ওপর সর্পনৃত্য দেখতে থাকেন।

ধ্যান করার সময় গান্ধী কথা বলতেন না। এক সন্ধ্যায় প্রার্থনায় বসার পর একটা সাপ পথ ভুলে সেখানে আসে। গান্ধীর সঙ্গীরা চঞ্চল হয়ে পড়েন, সাপটা ভয় পেয়ে নিরাপদ স্থানের সন্ধানে গান্ধীর কোলে আশ্রয় নেয়। ইশারায় সকলকে শান্ত থাকতে বলে গান্ধী যথারীতি প্রার্থনা করেন। সাপটা অবসর বুঝে পালায়।

গায়ে সাপ ওঠার পর তাঁর কি মনোভাব হয়েছিল এ প্রশ্নের উত্তরে গান্ধী বলেছিলেন, "এক মুহূর্তের জন্য অস্বস্তি বোধ হয়েছিল, পরে মন শান্ত হয়ে যায়। ঐ সাপটা আমাকে কামড়ালে বলতুম, "ওকে আঘাত করো না, ওর প্রতি হিংসা করো না, ওর মনে ভয় জাগিয়ে দিও না, ওকে স্বচ্ছন্দে চলে যেতে দাও।"

ঘটকপুরুত

গান্ধী ৩৭ বছর বয়সে ত্যাগী ব্রহ্মচারীর জীবনের ভক্ত হয়ে পড়েন এবং মনের সকল লোভ দমন করতে আরম্ভ করেন। ভাল খাওয়া, ভাল পরা, আরামে থাকা, স্ত্রীপুত্র পরিবারের প্রতি অত্যধিক মায়ামমতা পোষণ করা, সব বর্জন করতে থাকেন। ক্রমশ তাঁর মনে এই ধারণা দৃঢ় হতে থাকল যে যাঁরা দশের সেবক হবেন, যাঁরা পরাধীন ভারতের মুক্তি চাইবেন, তাঁদের কুমারকুমারী থাকা দরকার, তাঁদের সংসারের মায়ায় জড়িয়ে না পড়াই ভাল।

এই মনোভাব জন্মাবার আগে গান্ধীর মত ছিল একেবারে উল্টো। তিনি তাঁর সঙ্গী, বন্ধু, সহকর্মী সকলের বিয়ে দেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। নিজে আগ্রহ করে অনেকের ঘটকালি করতেন। তাঁর সাহেব বন্ধু পোলকের এক ইহুদী মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা চলছিল। পোলকের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না বলে তিনি বিয়ে করতে সাহস করছিলেন না জেনে গান্ধী উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, "তোমাদের যখন মনের মিল রয়েছে তখন টাকার কথা ভেবে পিছিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। টাকার প্রশ্ন তুললে গরীবদের কোনদিনই বিয়ে করা সম্ভব হয় না। যত শীঘ্র পার তোমরা বিয়ে করে ফেলো।" তাঁর আশ্বাস পেয়ে পোলকের ভাবী স্ত্রী যেদিন বিলেত থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় এলেন, তার পরদিনই গান্ধী নিজে চেষ্টা করে বিয়ের দপ্তরে গিয়ে খবর দিয়ে তাঁদের বিয়ের বন্দোবস্ত করে দেন। সাহেবমেমের বিয়েতে এক কালাআদমী তদবির তদারক করছে দেখে রেজিস্ট্রী আপিসের কর্তার মনে খটকা লাগে, তিনি ছুতোনাতা করে বিয়ে পিছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু গান্ধীর তাগাদায় তা সম্ভব হয়নি। এ বিয়েতে গান্ধী মিতবর সেজেছিলেন।

আর এক বন্ধু ওয়েস্ট সাহেবকেও গান্ধী পত্রে লিখলেন, "তুমি বিলেত থেকে জোড় বেঁধে চলে এসো।" অন্য ভারতীয় সঙ্গীদেরও তিনি বৌ নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় আসার পরামর্শ দিতে লাগলেন। সবাই দল বেঁধে এক মস্ত যৌথ পরিবার হয়ে আশ্রমে বাস করার সখ ছিল তাঁর মনে।

অনেক বছর পরে ভারতে ফিরেও গান্ধী তাঁর আশ্রমে কয়েকটি কর্মী ও পরিচিতজনের বিয়েতে ঘটকালি ও পুরুতগিরি করেছিলেন। একদিন বললেন, "বাবাঃ, আজ গোমাতা সেবা করার পুণ্যি করেছি।" কেন? একটি গোঁয়ার পাত্রের সঙ্গে আলাপ করে ব্যাপার সুবিধের নয় বুঝে তিনি বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দিয়ে বলেন, "ওর হাতে পড়লে মেয়ে সুখী হবে না। আমাদের দেশের মেয়েদের সঙ্গে আমরা বলির পাঁঠার মতো আচরণ করি। ইচ্ছামত কোপ মেরে গতি করি, তার যে কী সর্বনাশ হচ্ছে সে চিন্তাও করি না।" গান্ধী পুরানো ধাঁচের চলতি হিন্দু বিবাহপ্রথার বিরোধী ছিলেন।

তাঁর ঘটকালির ধরন ছিল অদ্ভুত। সাধারণতঃ ঘটকরা ভালভাবে জাতকুল মিলিয়ে বেশ অবস্থাপন্ন কেতাদুরস্ত পাসকরা পাত্রপাত্রীর জোড় মেলাতে উৎসুক থাকে। বিয়েতে যাতে বেশ ধুমধাম হয় আর তার মোটা টাকা পাওনা হয় তার জন্য চেষ্টা করে। দু-পাঁচটা বানানো কথা বলায় তারা পটু হয়। গান্ধী নিজে ঘটকবিদায় নিতেন না উপরন্তু বিয়েতে খরচের ঝামেলা ঘটতে দিতেন না। যারা খুব গরীব তারা শাঁখাসাড়ী পরিয়ে হরীতকী দান দিয়ে বিয়ে দেয়। গান্ধীর মতে ওটুকুই ছিল যথেষ্ট। ফুলমালার ছড়াছড়ি, আলোবাজনা, খাইখেলাই, কিছুই করতে দিতেন না। তাঁর ঘটকালির বিয়েতে বরকনে চরকায় কাটা সুতোর খদ্দর পরত, সুতোর মালা বদল করত আর আগুন সাক্ষী রেখে মন্ত্র পড়ত। গায়ে হলুদ, ফুলশয্যা, তত্ব, এ সবের পাট থাকত না। বর বেচারার ভাগ্যে ঘড়ি-আংটি, খাটপালঙ, পণযৌতুক কিছু মিলত না। দেতিলেতি অর্থাৎ পণ দেওয়ানেওয়ার কুপ্রথার গান্ধী নিন্দা

করতেন। কলেজের ছাত্রদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "তোমরা স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গিনী হৃদয়রাণী করার বদলে বেচাকেনার সামগ্রী করে তুলছ। যদি তোমরা পণপ্রথা রদ করার, তোমাদের বৌ বা বোনেদের পূর্ণ মর্যাদা দেবার প্রতিজ্ঞা নাও তবে দেশে সত্যি স্বরাজ আসবে।" মেয়েদের বলতেন, "একপয়সাও পণ দিয়ে বিয়ে করার চেয়ে সারাজীবন কুমারী থাকা বেশী সম্মানজনক।" যে পাত্রপাত্রীর পৈতৃক সম্পত্তি, পাস করার ছাপ বা গৌরবর্ণ তারা তত যোগ্য একথা তিনি ভাবতেই পারতেন না। নানা কাজে পটু হওয়া আর সৎচরিত্র হওয়াই মানুষের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা মনে করতেন। বলতেন, "ছেলে মেয়েদের জন্য টাকা জমানো মানে তাদের নষ্ট করা, তাদের যোগ্যতায় অবিশ্বাস করা। একথা কেন ভাবব যে আমার সন্তানরা আমার চেয়ে অক্ষম অকর্মণ্য হবে? সন্তানের প্রতি মা-বাপের সবচেয়ে বড় দান হচ্ছে সৎচরিত্র আর সৎশিক্ষা।"

তাঁর আশ্রমের যে কয়টি বিয়েতে তিনি পুরোহিতের কাজ করেছিলেন, সে সব বিয়েতে নিমন্ত্রিতদের কপালে ভোজ জুটত না। একদা অতিথিদের তিনি গ্রামে তৈরী এক এক খণ্ড পাটালি খাইয়ে মিষ্টিমুখ করিয়েছিলেন। সেজন্য সবশুদ্ধ ছ' আনা খরচ হয়েছিল। একবার এক পাত্রকে গান্ধী লিখে পাঠালেন, "তুমি অমুক ট্রেনে একা চলে এসো, আমি জোড় মিলিয়ে পাঠিয়ে দেব।" তার সঙ্গে যে নাপিতপুরুত বন্ধু বরকর্তা কারো আসার দরকার আছে এ তাঁর মনেই হয়নি। বরের সঙ্গে জনাসাতেক মানুষ দেখে গান্ধী বললেন, "এই যে সপ্তর্ষি এসে গেছে!" তারা বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। সপ্তর্ষির সঙ্গে অরুন্ধতীও (বরের মা) আছেন।"

বিয়ের ভোজে অত্যধিক আড়ম্বর ও ঐশ্বর্যের প্রকাশ তাঁর মোটে ভাল লাগত না। এই গণতন্ত্রের যুগে শুধু ধার্মিক অনুষ্ঠানের জন্য টাকা দশেক খরচ করা যথেষ্ট মনে করতেন। অতি দীন দেশবাসীর পক্ষেও তাঁর এ বিধান মেনে চলা দুষ্কর ছিল। শ্রাদ্ধ ও বিবাহ

উপলক্ষ্যে যে সব চাষীরা ঋণ করতে বাধ্য হত তাদের বলতেন, "আমি তোমাদের পুরুত হয়ে এসব কাজে যে বেশী টাকা লাগে না তা প্রমাণ করে দেব।" চলতি বিশ্বাস মতো তাঁর শ্রাদ্ধ কাজে শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁর মতে পিতৃপুরুষ বা পূর্বপুরুষদের প্রকৃত শ্রাদ্ধ হচ্ছে জীবনে তাদের গুণাবলীর প্রয়োগ করা। পৈতের সম্বন্ধে যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা চালু আছে তাও তিনি মানতেন না। শূদ্রের পৈতা ধারণ নিষেধ বলে পৈতে ত্যাগ করে বলেছিলেন, "পৈতে-ধারণ করার কোনও অর্থ আমি খুঁজে পাই না। আর্যরা আপন মাহাত্ম্য প্রচার করার জন্য পৈতে পরত, অনার্যদের থেকে নিজেদের পার্থক্য জানিয়ে দিত। উঁচুনীচুর চিহ্নহিসেবে এটা ব্যবহার করার চেয়ে বর্জন করাই বিধেয়। চরিত্রের শুচিশুদ্ধতাই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞোপবীত।"

বালবিবাহে গান্ধীর বিশেষ আপত্তি ছিল। মাত্র ১৩ বছর বয়সে নিজের বিয়ে হয়েছিল বলে বড় দুঃখে বলেছিলেন, "আমার আশ্রমের কিশোরকিশোরীদের দেখে যখন আমার বিয়ের কথা মনে করি তখন নিজের প্রতি বড় করুণা হয়। তারা আমার মতো দুর্ভাগা নয় বলে তাদের বাহবা দিই, তারিফ করি। অল্প বয়সে বিয়ে দেবার স্বপক্ষে আমি কোনও যুক্তি খুঁজে পাই না। আমাদের বিয়েতে আমাদের শুভাশুভের কথা চিন্তা করা হয়নি, মতামতের প্রশ্ন তো ওঠেইনি। বড়দের সখ মেটাবার জন্য এ বিয়ে ঘটেছিল।" যোল বছর বয়সের কমে কোনও মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করায় তিনি নারাজ ছিলেন। তাঁর এক ছেলের সম্বন্ধ স্থির হওয়া সত্ত্বেও কনের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হবার পর তিনি বিয়ে দিয়েছিলেন। বুড়ো বরেরা নাবালিকা খুকীকে বিয়ে করছে শুনলে তিনি বেজায় চটে যেতেন। তিনি জানতেন এভাবে বিয়ে দেওয়ার ফলে দেশে বালবিধবার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন লাখেরও বেশী। অজ্ঞান বালিকাদের তিনি বিধবা বলে মেনে নিতেন না। বিদ্যাসাগরের মতো গান্ধীও বলতেন যে এইভাবে কচি মেয়েদের বিধবা সাজাবার বিধান কোনও শাস্ত্রে নেই। বিধবা বিবাহে তাঁর সমর্থন ছিল। তিনি

বলতেন, "পনের বছরের বালিকাকে আমি বিধবা বলে ভাবতেই পারি না। মৃতদারের মতো বিধবাদের পুনর্বিবাহ করার সমান অধিকার আছে। পাত্রীর মত না নিয়ে তাকে পাত্রস্থ করাকে আমি যথাযথ বিবাহ বলে মানি না।"

বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি বিবাহবিচ্ছেদরীতিও সমর্থন করতেন। একবার জেল থেকে এক হিন্দু স্ত্রীকে প্রথম স্বামী বর্তমান থাকাকালে দ্বিতীয় বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি অসবর্ণ বিবাহ, ভিন্নধর্মের পাত্রপাত্রীর বিবাহ ও ভিন্ন দেশ বা প্রদেশবাসীর অন্তর্বিবাহ প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর আশ্রমে অনুষ্ঠিত সকল বিবাহ অসবর্ণ বিবাহ হোক এই তাঁর ইচ্ছা ছিল কিন্তু কার্যত তা হয়নি। তাঁর ছোট ছেলে গুজরাতী বৈশ্য হয়ে মাদ্রাজী ব্রাহ্মণকন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। এ মিলনে জাতিভেদের ও প্রাদেশিকতাবোধের বেড়া ভেঙে গিছল বলে গান্ধী খুব খুশী হয়েছিলেন। আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়—এই ছিল তাঁর ব্রত। অনেক অচ্ছুতদের বিয়েতে তিনি মন্ত্রপাঠ করেছিলেন। গান্ধী পুরুতের দক্ষিণা না নিলেও হরিজন তহবিলের জন্য চাঁদা পেলে নিতেন। একটি অসবর্ণ বিয়েতে পুরুতগিরি করে হরিজনদের জন্য কূপপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি ৫০০০ টাকা দান পেয়েছিলেন।

সাধারণ গুরুপুরুতের মতো তিনি নামাবলি গায়ে দিয়ে নস্যি নিয়ে বা হুঁকো টানতে টানতে উপদেশ দিয়ে দক্ষিণার লালসা প্রকাশ করতেন না। তিনি হিন্দুধর্মে আস্থাশীল ছিলেন। হিন্দুদের পুরানো ধর্মের বইয়ে বলে যে গৃহস্থকে প্রতিদিন "কর্মযজ্ঞ করতে হয়, ঘরে নিত্য পূজাহোম করতে হয়। গীতায় বলেছে, যে নিজে শ্রম না করে অলসের মতো অন্যের শ্রমে ভাগ বসিয়ে অন্নগ্রহণ করে সে তস্কর। গান্ধী দেহের শ্রম করা এ যুগের কর্মযজ্ঞ মনে করতেন; নিজে প্রতিদিন কিছু না কিছু শ্রম করে, বিশেষ সূত্রযজ্ঞ করে অন্নগ্রহণ করতেন। তিনি পাত্র-পাত্রীদেরও অন্নশ্রম করার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিতেন। হিন্দুমতে বিয়ের পর বরকনেকে একত্রে সাত পা এগিয়ে গিয়ে মন্ত্র পড়তে হয়। গান্ধী

এই সপ্তপদীর সপ্তযজ্ঞ নামে যে নতুন ব্যাখ্যা করেছিলেন, তার হিসেবমতো গোসেবা, গোশালা কুয়োতলা সাফ করা, সূতাকাটা ইত্যাদি সপ্তপদীর অঙ্গ ছিল।

তাঁর মা-বাবার হিঁদুয়ানী, রামায়ণ গীতাপাঠ ও ব্রতউপোস করার রীতি বালককাল থেকে তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। মাত্র ১৭ বছর বয়স থেকে তিনি জাতিধর্মের তফাত ভুলে সব মানুষকে ভাই বলে, এক ঈশ্বরের সন্তান বলে দেখতে শিখেছিলেন। মুসলমান, খৃষ্টান, মেথর মুচিতে ছুঁলে তাঁর প্রাণের ঠাকুর অশুচি হয়ে যেতেন না। তিনি স্থলে-জলে পতঙ্গে কীটে ধূলিকণায়—সর্বত্র ভগবানকে দেখতে পেতেন, অন্তরে তাঁর ইশারা শুনতেন। তাঁর মনে গোঁড়ামি ছিল না, নিজের ধর্মকে বড় করে অন্যের ধর্মকে তুচ্ছ হীন মনে করার ঝোঁক ছিল না। ধর্মের নামে, মন্দির-বিগ্রহ-গোরক্ষার নামে মানুষে মানুষে হানাহানি তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। বহু বছর ধরে, বিচারশীল মন নিয়ে, হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান-ইসলাম-পার্শী ধর্মের মূল বই গীতাউপনিষদ-বাইবেল-কোরাণ-জেন্দ আবেস্তা পড়ে তিনি সর্বধর্মে সমভাব পোষণ করতে শিখেছিলেন। ঐ সব গ্রন্থের উপদেশ তিনি নিজ জীবনে প্রয়োগপালন করে অন্যদের কাছে তার মাহাত্ম্য প্রচার করতেন। এই সর্বধর্মপ্রীতি তাঁর মনে সহিষ্ণুতা এবং দুঃখদহন সহন করার শক্তি জুগিয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে, যারা গাজুয়ারীর সমর্থক তারা অধার্মিক, যে আত্মবলে বলীয়ান্ সেই প্রকৃত ধর্মপরায়ণ সাধক। ধর্মান্তর ঘটানো, শুদ্ধি করা তাঁর কাছে নিরর্থক মনে হত। সত্যকথা বলা, সর্বজীবে ভালবাসা 'তাঁর ধর্ম ছিল। দিনের মধ্যে একআধঘণ্টা ঠাকুরঘরে জপধ্যান করে সারাদিন অন্যের সঙ্গে কলহ করার, অন্যকে হিংসা করার, কারো মন্দ হোক এ চিন্তা করার, লোক ঠকিয়ে মিথ্যাকথা বলে অর্থ উপার্জন করার ধাত তাঁর ছিল না। তিনি যা ধর্ম বলে বুঝেছিলেন দীর্ঘজীবনের প্রতিদিন প্রতিক্ষণে তা কাজে করতে চেষ্টা করেছিলেন। কখন কোনও ভুলচুক করলে প্রকাশ্যে

তা স্বীকার করতেন, লোকে কি বলবে এই ভয়ে দোষ গোপন করতেন না। তঞ্চকতা একেবারে সইতে পারতেন না।

তাঁর প্রার্থনার মন্ত্র ছিল অদ্ভুত। তিনি রামরহিমের নাম একসঙ্গে জপতেন। বহুবার গীর্জায় যীশুর ভজনায় যোগ দিয়েছিলেন। উপনিষদ কোরাণ, আবেস্তার দু'একপদ জুড়ে নিয়ে মন্ত্র পড়তেন। একা ধ্যান করতেন আবার দলবেঁধে রামধুন গাইতেন। সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের মতো ব্রাহ্ম-মুহূর্তে উঠতেন, প্রতিসকাল সন্ধ্যা প্রার্থনাভজন করতেন, দশের সেবা করতেন। তিনি জীবহিংসা করতেন না, মিথ্যা বলতেন না, রাগের বশে কাউকে শাপ গাল দিতেন না। জলেস্থলে যানে ভ্রমণে সর্বদা প্রার্থনাবিধি পালন করতেন। জাহাজে, ট্রেণে, পদযাত্রাকালে, প্রতিদিন গ্রাম থেকে ভিনগ্রামে পরিক্রমার সময়, নমঃশূদ্র, মুসলমান, পার্শী, শিখ, যে কোনও লোকের বাড়ীতে বসে, জেলে, স্বদেশে, সাহেবদের দেশে, কখনও তাঁর এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। তিনি না খেয়ে দিনের পর দিন থাকতে পারতেন কিন্তু ঈশ্বরের আরাধনা না করে একটি দিনও কাটাতেন না।

তিনি অনায়াসে গীতা, কোরাণ, বাইবেল, বৌদ্ধ ধর্মপুস্তকের ব্যাখ্যা করতে পারতেন। তাঁর বাইবেলের ব্যাখ্যা শুনে সাহেবেরা অনেকে মনে করত যে তিনি খৃষ্টান ছিলেন। জনসভায় প্রার্থনাকালে কোরাণের বয়েত উচ্চারণ করতেন বলে কিছু হিন্দু ও মুসলমানে আপত্তি জানিয়েছিল। তাঁর হিন্দুধর্মের বিচিত্র ব্যাখ্যার জন্য এবং কোনও মানুষকে ছোটজাত অচ্ছুত বলে না মানার জন্য গোঁড়া হিন্দুরা তাঁকে দেখতে পারত না। তারা কালোপতাকা উঁচিয়ে, জুতোর মালা দুলিয়ে তাঁকে অপদস্থ করেছিল, একাধিকবার প্রাণে মারার চেষ্টাও করেছিল। তবু গান্ধী বলতেন, "যদি হিন্দুধর্মে মানুষকে ঘৃণা করে দূরে ঠেলে রাখার বিধান থাকে তো আমি হিন্দু হতে চাই না। সে হিন্দুধর্ম যত শীঘ্র লোপ পায় ততই মঙ্গল। আমাদের ধর্ম প্রেমের ধর্ম। সে প্রেম কেবলমাত্র আমাদের বন্ধুপ্রিয়জন বা প্রতিবেশীর প্রতি প্রসারিত নয়, যদি কেউ শত্রু থাকে তার প্রতিও প্রযোজ্য।"

যে মন্দিরে ছোটজাতেদের ঢুকতে দেওয়া হত না, তিনি সে মন্দিরে যেতেন না, বলতেন, "যে মন্দিরে ভগবানের ভক্তদের ঢোকার অধিকার নেই সেখানে ভগবান আছেন এত বড় কলঙ্কময় মিথ্যা আমি কিছুতে মেনে নেব না।" ছোটজাত সঙ্গে নিয়ে দেবমন্দিরে ঢুকতে চেষ্টা করেছিলেন বলে পাণ্ডারা তাঁকে আক্রমণ করেছিল। সকল মন্দিরে যাতে সব জাত ঢুকতে পারে সেজন্য তিনি অনেক আবেদন আন্দোলন করার ফলে কয়েকটি মন্দিরের দরজা সকলের জন্যে খুলে গিয়েছিল।

নিজের বা অন্যের কোনও অপরাধ ঘটলে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তিনি উপবাস করতেন। তিনি জন্মান্তরবাদে, পাপপুণ্যে, শরীরকে ক্লিষ্ট করায় বিশ্বাস করতেন। তাঁর আশ্রমে কেউ মিথ্যা বললে, ঠকালে বা লোভ লালসা প্রকাশ করলে তিনি পাপক্ষালনের জন্য উপোস করতেন। সে উপোস কখনও কখনও ২১ দিন চলত। গান্ধীর চোখে ঈশ্বর ছিলেন সত্যম্। তিনি নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার পক্ষপাতী হলেও মূর্তিপূজার বিরোধ করেননি। কারণ "মূর্তিপূজকরা মূর্তির মধ্যে যে ভগবান আছেন তাঁর পূজো করে, ধাতু কাঠ পাথর পূজো করে না।" এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনাকালে গান্ধী বলেছিলেন, "পতিত জাত হাড়িডোমচণ্ডালের ঠাকুর অশথতলায় সিঁদুরলেপা পাথরটুকুর মূল্য আছে। ঐ তো তাদের ভগবানের সঙ্গে যোগের সেতু। একজন পঙ্গুকে সিধেভাবে হাঁটতে শেখাবার আগে তার হাত থেকে ভর-করার লাঠি আপনি কেড়ে নিতে পারেন না।" বৃক্ষ প্রতিষ্ঠার রীতিও তিনি তুচ্ছ করতেন না কারণ "এর আড়ালে গভীর মমতা, কারুণ্য আর কাব্যমাধুরী লুকিয়ে আছে। ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করে যে বৃহৎ তরুজগৎ, বৃক্ষপূজা তার প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।"

আজকাল মন্ত্রীশাস্ত্রীরা ভিতপত্তন, গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন, আগে এসব কাজ গুরুপুরুতে করত। গান্ধী বহু বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও আশ্রমের ভিত্তিস্থাপনা করেছিলেন, বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন। যারা তাঁকে মহাপুণ্যবান জ্ঞানীত্যাগীতপস্বী

মনে করত তারা, তিনি জাতে বেণে হলেও, তাঁকে দিয়ে দেবদেউল প্রতিষ্ঠা করিয়েছিল। নোয়াখালিতে দাঙ্গার সময়ে এক গৃহস্থ তাঁকে দিয়ে মুসলমানের আক্রমণে বিধ্বস্ত বিগ্রহের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়েছিল। তিনি দিল্লীর লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, কাশীর ভারতমাতার মন্দির, সেলুর হরিজন মন্দির আর রত্নগিরির মারুতি মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছিলেন। মারুতি মন্দির খোলার সময়ে গান্ধী বলেছিলেন, "মারুতির দৈত্যের মতো শক্তি ছিল বলে আমি তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করছি না। রাবণের প্রবল অসুরশক্তি ছিল। মারুতির আত্মবল ছিল। মনোবলের জোরে তাঁর দেহের বল বেড়েছিল। শ্রীরামের প্রতি অসীম একান্ত ভক্তি ও ব্রহ্মচর্যের ফলে তাঁর ঐ মনোবল জন্মেছিল।"

গান্ধীর রামনামে অটল বিশ্বাস ছিল। প্রায় ৮০ বছর বয়সে প্রার্থনাসভায় যাবার পথে এক গোঁড়া ক্ষেপা হিন্দুর গুলিতে আহত হয়ে তিনি "হে রাম" বলে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

BAHUROOPEE GANDHI * ANU BANDYOPADHYAYA * Rs. 6·00

অমর জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

দ্বারকার কাছে কাঠিয়াবাড়ের পোরবন্দরে দিদি ও দুই দাদার পর পুতলীবাঈয়ের কোলে ছোট ছেলেটি হয়ে মোহনদাস জন্মান ১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর। বংশগত বণিকবৃত্তি ছেড়ে তাঁর বাবা করমচাঁদ গান্ধী দেশীয় রাজ্যে মন্ত্রীগিরি করেছিলেন, ঠাকুর্দাও ছিলেন উজীর। সমুদ্রের ধারে একটি দোতলা বাড়ী তাঁদের ছিল, কিন্তু তাঁরা কেউ বিলাসী বড়লোক ছিলেন না। মোহনদাস গান্ধীর মা বাবা দুজনেই গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন। গান্ধী মায়ের কোলে বসে অণুতে-পরমাণুতে, সর্বজীবে ঈশ্বর আছেন, অন্য সব ধর্মই শ্রদ্ধেয় আর হিন্দু মুসলীম খৃষ্টান ব্রাহ্মণ শূদ্র সবাই এক ঈশ্বরের সন্তান এ শিক্ষা পেয়েছিলেন। পাঠশালার পড়ুয়া অবস্থায় সমবয়সী কস্তুরবাঈয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল বারো বছর বয়সে। রাজকোটের অ্যালফ্রেড্ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে আঠার বছরের গান্ধী মোঢ়বানিয়াদের মধ্যে প্রথম কালাপাণি পার হয়ে বিলেত যান ব্যারিস্টার হবার জন্য। নির্দিষ্টকালে আইন পাশ করে তিন বছর পরে দেশে ফেরেন।

আবার দু'বছর পরে মহাসাগর পাড়ি দিয়ে গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন আইনের কাজ করে কিছু উপার্জনের জন্য। বিশ বছর ছিলেন প্রবাসে—সেই দেশে, যেখানে সাহেব রাজা, কালা আদমীরা গোলাম। কালা মানুষ ভারতীয় ও নিগ্রোদের ওপর নানা কালা কানুন করে অবিচার করা হত। গান্ধী তার প্রতিবাদ করে কয়েদ খেটে-ছিলেন। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে ভারতে ফিরেও ইংরেজের দাস দেশবাসীর সম্মান স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি দীর্ঘ ত্রিশ বছর লড়েছিলেন। ধনী-দরিদ্র, ছোটজাত-উঁচুজাত, স্ত্রী-পুরুষের অসাম্য ঘোচাবার জন্য বহু চেষ্টা তিনি করেছিলেন। বার বার ভারতময় ঘুরে, পত্রপত্রিকায় লিখে, সভায় বক্তৃতা দিয়ে সমাজের বহু কদভ্যাস দূর করতে

শেখাতেন। তাঁর ব্রত ছিল আপনি আচরি ধর্ম অন্যেরে শিখানো। তাই লোককে যা করতে বলতেন তা আগে নিজের জীবনে প্রয়োগ করতেন। প্রকৃত স্বদেশীয়ানা ও স্বরাজ কি তা বোঝাতে চেয়ে নিজে বিদেশী জিনিস ত্যাগ করেছিলেন, খাদির পুনর্জন্ম ঘটিয়েছিলেন। দেশ-মায়ের দেওয়া মোটা ভাত-কাপড়ে তুষ্ট থাকতে চেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অশরণের শরণ, দুঃখীর বন্ধু তাই নাম যশ অর্থ মানের মায়া কাটিয়ে চরকায় কাটা খাদির কপ্‌নি চাদর পরে আশ্রমে বাস করতেন। খদ্দর প্রচার, অস্পৃশ্যতা ঘোচানো তাঁর স্বপ্ন ছিল। উদাসীন শাসকের সঙ্গে অসহযোগ করে, খাজনা বন্ধ করে, সত্যাগ্রহ করে, 'ভারত ছাড়' আন্দোলন করে তিনি ঘুমন্ত দেশবাসীকে জাগিয়েছিলেন ; শক্তিমদে মত্ত ইংরেজ রাজের সিংহাসন টলিয়েছিলেন। তিনি কখনও কোনও ফললাভের জন্য অসৎ উপায়ের সাহায্য নিতেন না, তঞ্চকতা করতেন না বা তলোয়ার-বন্দুক নিয়ে হিংস্রভাবে মারামারি করতেন না। মানুষের মধ্যে সদ্ভাব জাগাবার চেষ্টায় বুদ্ধ যীশু চৈতন্যের পথের পথিক এই মানুষটি ভারত স্বাধীন হবার মাস ছয় পরে এক বিভ্রান্ত হিন্দুর গুলীতে আহত হয়ে মরণ বরণ করেন ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী।

ঘটনাপ্রবাহ

গান্ধীজীর জন্ম : পোরবন্দর, ২রা অক্টোবর, ১৮৬৯ খৃঃ
কস্তুরবার সঙ্গে বিবাহ : ১৮৮১
ম্যাট্রিক পাশ : নভেম্বর, ১৮৮৭
আইন পাঠের জন্য লণ্ডন যাত্রা : অক্টোবর, ১৮৮৮
ব্যারিস্টারী পাশ : জুন, ১৮৯১
ভারতে ফিরে আসেন : জুন, ১৮৯১
দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করেন : এপ্রিল, ১৮৯৩
ভারতে জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে প্রথম উপস্থিত থাকেন : ১৯০১
ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন সাপ্তাহিকের ভার নেন : ১৯০৩
ফিনিক্স বসতি স্থাপনা করেন : ১৯০৪
ভারতীয় সেবাদলের নায়কত্ব করেন বুয়োর যুদ্ধে : ১৮৯৯
এবং জুলুবিদ্রোহে : ১৯০৬
প্রবাসী ভারতীয়দের দাবী পেশ করতে ইংলণ্ডে যান : ১৯০৬ এবং ১৯০৯
দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম কারাবরণ : ১৯০৮
দক্ষিণ আফ্রিকায় বিরাট সত্যাগ্রহী দল নিয়ে পদযাত্রা করেন : ১৯১৩
দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করে ভারতে আসেন : জানুয়ারী, ১৯১৫
আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন সবরমতীতে : ১৯১৫, ওয়ার্ধায় ১৯৩৩ এবং সেবাগ্রামে ১৯৩৬
চম্পারন সত্যাগ্রহ করেন : ১৯১৭
খেড়ায় প্রথম কর না দেওয়ার আন্দোলন করেন : ১৯১৮
অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটে ১৯১৯
ইয়ং ইণ্ডিয়া এবং নবজীবনের সম্পাদনার ভার নেন : ১৯১৯

অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন : ১৯২১
ভারতে প্রথম কারাবরণ ঘটে : ১৯২২
খাদি প্রচারের জন্য ভারত সফর করেন : ১৯২৭
দণ্ডীযাত্রা ও লবণ সত্যাগ্রহ করেন : ১৯৩০
লণ্ডনে গোলমেজ বৈঠকে যোগ দেন এবং ইওরোপ ভ্রমণ করেন : ১৯৩১
হরিজনদের উন্নয়নকল্পে ভারত সফর করেন : ১৯৩৩
হরিজন পত্রিকার প্রচলন করেন : ১৯৩৩
'নয়ী তালিম' শিক্ষা প্রণালীর প্রবর্তন করেন : ১৯৩৭
'ভারত ছাড়' আন্দোলন প্রচার করেন : ১৯৪২
জীবনের শেষ কারাবাস ঘটে আগা খাঁ প্রাসাদে : ১৯৪২
গুলীবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান : ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮

আমাদের প্রকাশনায় অন্যান্য কিশোর গ্রন্থ

॥ কিশোর গ্রন্থ ॥

পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

অমর জহর (৪র্থ সংস্করণ)

(ছন্দে গাঁথা জহরলাল নেহরুর জীবনী) ... ... ১·০০

এন. কারাজিন/সরিৎশেখর মজুমদার

উড়ে চলি দক্ষিণে

(সারসদের বিচিত্র অভিযান-কাহিনী) ... ... ৩·৭৫

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

গড় জঙ্গলের কাহিনী

(উপন্যাস) ... ... ৩·৫০

কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়

চুস্থলিকা

(দাদু ও নাতনীর কথামালা) ... ... ২·০০

অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর

(শিল্পগুরুর জীবনকথা) ... ... ৩·০০

লরিন জিলিয়াকাস/পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাকের কথা

(ভারতীয় অংশযুক্ত ডাক ব্যবস্থার ইতিকথা) ... ... ৪·০০

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বোর্ডির ইস্কুল

(উপন্যাস) ... ... ৩·০০

পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

মাটির মানুষ লালবাহাদুর

(ছন্দে গাঁথা লালবাহাদুরের জীবনী ... ... ১·০০

পরিচয় গুপ্ত

আষাঢ়ে ভূতের গল্প ... ... ৪·০০